দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ২২ আগস্ট, ২০২২।।
৫ ভাদ্র - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, ৫ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২২ আগস্ট - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বিষাক্ত হাত আর দুষ্ট মাতাকে ত্যাগ করা উচিত— বলেছেন চাণক্য ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

চোরের দিদির বড়ো চাপ... ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

আজকের ভারত নিজের শর্তে বিশ্বজনীন ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

অখণ্ড ভারতের প্রত্যাশা জাগাচ্ছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

প্রেম ও প্রত্যয়ের আবহমান পরম্পরা ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ১১

পরমাণু যুদ্ধ এড়াতেই কি মাত্র পাঁচ গ্রামের প্রস্তাব করেন শ্রীকৃষ্ণ ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৩

পায়ে পায়ে পঁচাত্তরে ◻ বিজয় আঢ্য ◻ ২১

সূর্যমুখী স্বস্তিকার অনির্বাণ শিখা ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৩

মানুষকে পথ দেখাতে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ◻ সরোজ চক্রবর্তী ◻ ৩১

ভূকৈলাসের যমজ শিবমন্দির ◻ মদনমোহন সিংহ ◻ ৩৩

স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেদিনের স্বস্তিকা ◻ প্রদীপ ঘোষ ◻ ৩৫

বাংলা জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার ক্রমবিবর্তন ও স্বস্তিকা ◻ অসীম কুমার মিত্র ◻ ৩৭

হাসিনা সরকার গদি বাঁচাতে হিন্দুদের ব্যবহার করছে ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৪৩

স্বস্তিকার প্রথম আবির্ভাব কাহিনি ◻ ভৈরব চন্দ্র ভট্টাচার্য ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪৪-৪৫ ◻ চিত্রকথা : ৫০

এই সংখ্যায় স্বস্তিকা ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতা ছাড়া এই দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। আশারাখি, আগামীতেও এই সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না।

সকলকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা।

—স্বস্তিকা পরিবার

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ২৯ আগস্ট ২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মোদী বিরোধীদের দুর্নীতি

নরেন্দ্র মোদীকে কুকথা না শোনালে যাদের ভাত হজম হয় না, তারা আজ দুর্নীতির পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছেন। এই তালিকায় সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াঙ্কা যেমন আছেন, ঠিক তেমনই আছেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় রাউত, অনিল দেশমুখ, আম আদমী পার্টির মন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া, সত্যেন্দ্র জৈন আরও অনেকে। দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠবে আর পশ্চিমবঙ্গ থাকবে না, তা হতেই পারে না। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হয়েছেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গোরু পাচার কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলও। লাইনে আছেন আরও অনেকে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে দেশজুড়ে দুর্নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। লিখবেন সুজিত রায়, হীরক কর, সুমন চন্দ্র দাস, নিখিল চিত্রকর, ড. রাজলক্ষ্মী বসু প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

প্রকাশিত হবে ২৯ আগস্ট ২০২২

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘ কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সহযোগ রাশি ২৫০্ টাকা।

জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে অতিরিক্ত ৫০্ টাকা ডাকমাশুল পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**

A/C. No. : **0954000100121397**

IFS Code : **PUNB0095400**

Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK VIVEKANAND ROAD Kolkata - 700 006**

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পঁচাত্তরে স্বস্তিকা

সময়ের প্রয়োজনেই স্বস্তিকা পত্রিকা আজি হইতে চুয়াত্তর বৎসর পূর্বে তাহার যাত্রা শুরু করিয়াছে। এই যাত্রায় বর্তমান সংখ্যায় স্বস্তিকা পঁচাত্তর বৎসরে পদার্পণ করিল। বলা হইয়া থাকে যে, সংবাদপত্র গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। ইহা অতীব সত্য কথা। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলা-সহ সমস্ত ভারতীয় সংবাদপত্র ও পত্রিকার লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর ভারতবোধ সৃষ্টি করা। তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাংবাদিককুলের আদর্শ ছিলেন হরিশ মুখার্জি। তিনি তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার মাধ্যমে অত্যাচারী ইংরেজ বিশেষ করিয়া নীলকর সাহেবদের চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তৎকালীন ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিও ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজদের অত্যাচার ও দমনপীড়নের কথা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিত না। তখন সাংবাদিককুলের মেরুদণ্ড ছিল ঋজু। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাংবাদিকদের মেরুদণ্ড কেমন যেন শিথিল হইয়া পড়িল। তাহা না হইলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো প্রখর জাতীয়তাবাদী সংগঠন, যাহাদের ব্রত কেবলই দেশের উত্থানের জন্য, দেশের সেবার জন্য মনুষ্য নির্মাণ— গান্ধী হত্যার মিথ্যা অজুহাতে তাহাদের উপর নির্মম অত্যাচার নামিয়া আসিল, অথচ দেশের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ যে সংবাদপত্র, তাহাদের সাংবাদিককুলের লেখনী একবারও গর্জিয়া উঠিবার সাহস দেখাইতে পারিল না। ইহা আশ্চর্যের বিষয় বই কী! বস্তুত, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় আসিয়াছে দলবাজি ও রাজনৈতিক প্রভাব। ইহার সঙ্গেই শুরু হইয়াছে অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন এবং তথ্য বিকৃতি করিয়া পাঠককুলকে বিভ্রান্ত করিবার অপচেষ্টা। একশ্রেণীর সংবাদপত্র সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিয়া নবপ্রজন্মের মন হইতে ভারতবোধকে সমূলে বিনষ্ট করিবার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কয়েকজন প্রবীণ কার্যকর্তা মিলিত হইয়া বাঙ্গালি পাঠকদের মনে ভারতবোধ সঞ্চারিত করিবার মানসে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিবার মনস্থ করিলেন। সেই নিমিত্ত ১৯৪৮ সালে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর শুভদিনে স্বস্তিকা পত্রিকা জন্মলাভ করিয়া শুভকর্ম পথে অগ্রসর হইতে শুরু করিল। এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পঁচাত্তর বৎসরে পদার্পণ করিল।

স্বস্তিকার চুয়াত্তর বৎরের এই যাত্রাপথ খুব একটা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। শিশু স্বস্তিকাকেই সরকারের রোষে পড়িতে হইয়াছিল। তাহার সমাপ্তি ঘটাইবারও আয়োজন করা হইয়াছিল। রাজ্য সরকারের পুলিশ নবাগত সম্পাদক মহাশয়কে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করিয়াছিল। তাহার পরে এক সম্পাদক মহাশয়কে দুইবার কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ ছিল স্বস্তিকার প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দেওয়া। কিন্তু কর্তব্যকর্মে অবিচল পরিচালক মণ্ডলী তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে স্বস্তিকার চলিবার পথ সুগম করিয়াছেন। ১৯৯২ সালেও বাম সরকারের পুলিশ স্বস্তিকা দপ্তরে তালা ঝুলাইয়া সম্পাদক মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও স্বস্তিকা ঠিক সময়ে প্রকাশিত হইয়া পাঠকের হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবোধ সঞ্জাত প্রবন্ধাদি প্রকাশনার জন্য অদ্যাবধি সম্পাদকীয় বিভাগকে মাঝে মধ্যেই হুমকির সম্মুখীন হইতে হইতেছে। স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধিদেরও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হইতে হইতেছে। এত কিছু করিয়াও স্বস্তিকার অগ্রগতি স্তব্ধ করা যায় নাই। এই দীর্ঘ চুয়াত্তর বৎসরে পরিচালক মণ্ডলী যেইভাবে দৃঢ়তার সহিত স্বস্তিকাকে পরিচালনা করিয়াছেন, তেমনই যোগ্য সম্পাদকগণও অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করিয়াছেন। সবচাইতে বড়ো কথা হইল, এই দীর্ঘ যাত্রাপথে স্বস্তিকাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন স্বনামধন্য ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও লেখকগণ। আর দীর্ঘ সময় ধরিয়া স্বস্তিকাকে যিনি প্রাণশক্তিতে ভরপুর করিয়াছেন তিনি ভবেন্দু ভট্টাচার্য। তৎকালীন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক একনাথ রানাডের অনুরোধে তিনি স্বস্তিকার দায়িত্ব লইয়া আমৃত্যু সেই দায়িত্ব নির্বাহ করিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে যাত্রা শুরু করিয়া বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করাই শুধু নহে, তাহাকে জয় করিয়া যাত্রাপথে অবিচল থাকা— ইহা একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদেই সম্ভব হইতেছে। জয়তু শ্রীকৃষ্ণ।

সুভাষিতম্

ধনধান্যসুসম্পন্নং স্বর্ণরত্নময়াকরম্।

সুসংহতিং বিনা রাষ্ট্রং ন ভবেদ বিভবাস্পদম্।।

ধনধান্যে সুসম্পন্ন এবং মণিমানিক্যে পরিপূর্ণ হলেও সংগঠিত শক্তি বিনা রাষ্ট্র বৈভবশালী হতে পারে না।

বিষাক্ত হাত আর দুষ্ট মাতাকে ত্যাগ করা উচিত— বলেছেন চাণক্য

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনৈক তৃণমূল নেতার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'দিদি খুশ হুয়া?' প্রশ্নে অনেক ইঙ্গিত রয়েছে। আর উত্তরটা আরও জটিল। দুর্নীতি-রাজ্য জুড়ে যে নৈরাজ্য চলছে তা বোঝাতে আচার্যশ্রেষ্ঠ চাণক্যের বাণী ব্যবহার ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। চাণক্যসূত্রে বলা হয়েছে, 'স্বহস্তোহপি বিষদগ্ধশ্ছেদ' আর 'মাতাপি দুষ্টা ত্যাজ্যা।' তার মানে দুষ্ট মাতাকে পরিত্যাগ করা আর বিষাক্ত হাত কেটে ফেলা উচিত। রাজা নয়, প্রজাদের উদ্দেশেই বলেছিলেন আচার্যশ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এখানে এই প্রতীক কার জন্য ব্যবহৃত হলো? অর্বাচীনরা উত্তর দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূল দল। কিন্তু শুধু তা নয়। কারণ সেটা হলে আচার্যদেবকে প্রয়োজন ছিল না। বিরোধী আর শাসক দলের দৈনিক অসহ্য বাদানুবাদ ব্যবহার করলেই চলত। তাছাড়া বিরোধীদের অনেকেই তো মমতা আর তাঁর নেতাদের দোষে দুষ্ট। তাদের এক নেতা হাসপাতালকে তাঁর পরিবারের সম্পত্তি ভেবে ২৩ বছর ধরে (১৯৮৯ থেকে ২০১২) দখল করে রেখেছিলেন। সুতরাং বিরোধী মুখ যে স্বচ্ছ তা বলা যাবে না। তবে মমতার কালির তুলনায় তা কিছুই নয়।

সরকারে আসার দু'বছরের মধ্যেই মমতা আর তার দল দুর্নীতির সমুদ্রে ডুবে যায়। তবে তা বোঝা গেল দশ বছর পর। রাজ্যের মানুষের দুর্ভাগ্য যে তারা দশ বছর ধরে রাজনৈতিক ধোঁকা খেয়েও মমতাকে তিনবার জিতিয়েছেন। ৩৪ বছরে বাম জমানার প্রথম দশ বছর বাদ দিলে বাকি ২৪ বছরের ধোঁকাবাজির রিপিট পারফরমেন্স চালিয়েছে তৃণমূল সরকার। তফাতটা বাম জমানায় ছিল গায়ের জোরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল আর মমতা জমানায় নেতা-মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ধোঁকাবাজি।

তদন্তের গুঁতোয় মমতা আর দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাঁকডাক শুরু করেছেন বটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু। কারণ দুর্নীতি রুখতে তারা নিজেদের থেকে তদন্ত সংস্থার উপর নির্ভরশীল বলেই মনে হয়। তাই তদন্ত সংস্থা চোর ধরে দিলে তবে তারা ব্যবস্থা নেবেন। নিজেরা কোনো বিহিত করবেন না। স্বাভাবিকভাবে তাই মমতাকে দুর্নীতির ফোয়ারা বলা হচ্ছে। কারণ তাঁর আশ্রয় আর প্রশ্রয়েই বেড়েছে দলের দুর্নীতিবাজ নেতারা।

অথচ তৃণমূলের সংবিধানের ২১ নং ধারার ৬ (৫) নং নিয়মাবলীতে দুর্নীতি ধরা পড়া মাত্র তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি তৈরি ও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সব জেনে বুঝে চোখ উলটে রেখেছিলেন মমতা। দাগি নেতারা নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ তিনি ঠুঁটো জগন্নাথ। কোনোরকম গভীর স্বার্থ জড়িত না থাকলে সাধারণত এরকম হয় না। সন্দেহের তির এখন মমতার দিকে উদ্যত। তাই অনেকের ধারণা তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত হবে। রাজ্য জুড়ে একটাই আওয়াজ 'চনোপুঁটি না ধরে রুই-কাতলা ধর'।

দাবিটা আবেগপ্রবণ আর অর্থহীন। কারণ তা বুমেরাং হতে পারে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর পার্থবাবুকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অনুব্রত মণ্ডল আটক হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শোনা যাচ্ছে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আর মলয় ঘটক তদন্তকারীদের তালিকায় রয়েছেন। এবার তাঁরাও নাকি গ্রেপ্তার হতে পারেন। তবে এসব অনুমান।

> "তদন্তের গুঁতোয় মমতা আর দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাঁকডাক শুরু করেছেন বটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু। কারণ দুর্নীতি রুখতে তারা নিজেদের থেকে তদন্ত সংস্থার উপর নির্ভরশীল বলেই মনে হয়। তাই তদন্ত সংস্থা চোর ধরে দিলে তবে তারা ব্যবস্থা নেবেন। নিজেরা কোনো বিহিত করবেন না।"

চোরের দিদির বড়ো চাপ......

স্নেহের দাদা ও ভাইয়েরা,

দিদির কথা ভাবুন। দুই ভাই হাজতে। এক বোনের মতো, সেও হাজতে। তাঁকে যদিও দিদি এখন আর চেনেন না! কিন্তু তারপর? তারপর মানে দিদির বাড়িতে অতিথি এলে তারপর?

তিনি খুবই চিন্তিত। আপনারা তৈরি থাকুন। না, পালানোর জন্য নয়। দিদির জন্য আত্মত্যাগের ব্রত নিয়ে তৈরি থাকুন। যিনি দিনের পর দিন সব ভাইদের ক'রে খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যিনি কেউ কোনও দোষ করলে বাচ্চা ছেলে বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, ছোট ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আজ তাঁর বিপদের আশঙ্কা। এমন পরিস্থিতিতে এখন থেকে কোমর বেঁধে তৈরি হোন।

দিদির তো শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা নয়। মনে রাখবেন, দিদি সোনা বউমার পিসি শাশুড়ি। তিনি সেই বউমার স্বামীর নিজের পিসি। তাই তো দিদি সেদিন পার্থর পাড়ায় গিয়ে বললেন, ‘‘কাল যদি আমার বাড়িতে যায়, কী করবেন? রাস্তায় নামবেন তো!’’

এই আর্তিটা বুঝতে পারছেন! না বুঝতে পারলে কীসের ভাই আপনারা। খোঁজ নিয়েছেন, দিদি কবিতা লিখতে পারছেন কি না। গলা শুকিয়ে গিয়েছে। এখন শুনছি কলমের কালিও শুকিয়ে গিয়েছে। কবিতা বেরোচ্ছে না। গলার কাছটায় কী যেন একটা দলা পাকিয়ে আছে। এটাকেই মনে হয় উৎকণ্ঠা বলে। উৎকণ্ঠার পিটুলি কণ্ঠে আটকে গিয়েছে।

পার্থ ভাই, অনু ভাই উঠে গেছে। অর্পিতাও জেলে। ওর সঙ্গে ওড়িয়ায় গল্প করাও যাচ্ছে না। তাই তো দিদি বলছেন, ‘‘যদি আমার কোনও সহকর্মীকে ইচ্ছা করে জেলে ধরে রেখে দেয়, তাহলে গণতান্ত্রিক ভাবে প্রতিবাদ করতে হবে।’’ আর্তিভরা গলায় বলছেন, ‘‘কাল যদি আমার বাড়িতে যায় কী করবেন? রাস্তায় নামবেন তো!’’ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে কারা আসবে তা তিনি স্পষ্ট করে না বললেও কর্মী, সমর্থকরা সমস্বরে আন্দোলনে নামার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে। এর পরেই বলেন, ‘‘গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করবেন তো? আমারটা আমি একাই লড়ে নেব। কিন্তু আপনাদেরটা আপনাদের লড়ে নিতে হবে তো!’’ সবাই তাতেও ঘাড় নেড়েছে। কিন্তু দিদি শান্তিতে নেই।

কারণ দিদিই তো বলেছেন কেউ অন্যায় করলে সে লড়াই তাঁর নিজের। তাহলে সেটা তো সবার জন্যই এক হবে। তাঁর পরিবারে কিছু হয়ে গেলে সেই

> ‘‘উনি জেনেছেন যে, দলনেত্রী ওঁকে সমর্থন করেছেন। তাতে ওঁর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। উনি বলেছেন, আমি জানতাম দিদি আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। আমাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমার সঙ্গে কোনও ভাবে এই ঘটনার যোগ নেই।’’

লড়াই তো শুধু তাঁর পরিবারেরই। ঈশ্বর করুন, তাঁর ব্যক্তিগত কিছু যেন না হয়। কিন্তু ঈশ্বর কি শুনবেন! কারণ, ও দিকে যে প্রধানমন্ত্রী দেশ মায়ের নামে শপথ নিয়ে নিয়েছেন। কাউকে দুর্নীতি করতে দেবেন না। পরিবারবাদ চলবে না। কেন্দ্রীয় সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

তাই ভাইয়েরা তৈরি থাকুন। দিদির লড়াই যেন একার না হয়ে যায়। তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনার লড়াই কিন্তু আপনার একারই হবে। সেই সময় দল বা দিদি আপনাকে চিনতেই পারবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে অনুব্রতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন দিদি, ঘটনাচক্রে সেটি ছিল গ্রেফতার হওয়া আরেক ভাই পার্থর বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিম। অনুব্রতের প্রশংসা করলেও পার্থ সম্পর্কে প্রায় নীরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এক সময়ের নম্বর টু, এখন নো নম্বর হয়ে গিয়েছেন। দল আগেই বলেছিল, ‘আইন আইনের পথে চলবে।’ এর আগেও দলের তরফে একই বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া আর একটি মন্তব্যও করেননি মুখ্যমন্ত্রী। যদিও সেখানে দাঁড়িয়েই বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রতের পাশে থাকার বার্তা দেন মমতা। তিনি জানিয়েছিলেন, অনুব্রত কিছুই চায় না। এমনকী তিনি রাজ্যসভায় পাঠাতে চাইলেও ‘কেষ্ট’ রাজি হননি।

অনুব্রতের আইনজীবীও দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেল নির্দোষ। দলনেত্রীর বার্তা পেয়ে তাঁর মক্কেলের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। অনির্বাণ বলেন, ‘‘উনি জেনেছেন যে, দলনেত্রী ওঁকে সমর্থন করেছেন। তাতে ওঁর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। উনি বলেছেন, আমি জানতাম দিদি আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। আমাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমার সঙ্গে কোনও ভাবে এই ঘটনার যোগ নেই।’’

এটা কিন্তু সবটা সত্যি নয়। এই পাশে থাকা মোটেও থাকা নয়। থাকার ভান।

অতিথি কলম

আজকের ভারত নিজের শর্তে বিশ্বজনীন

স্বপন দাশগুপ্ত

ভারত ভ্রমণে বেরোলে দেখা যাবে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এখন আর চেনাই যায় না। এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও ‘চলতা হ্যায়’ গোছের নেতিবাচকতার জায়গায় ‘আমরাও পারি’র মতো ইতিবাচক সকংল্প।

আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে সার্বভৌমত্বের যে ধ্বজা উড়ছে সেই সঙ্গেই এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দেরও ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালনের মুহূর্তও সমাগত। এই সেই দুর্বার ব্যক্তিত্ব যিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে আশ্রমিক জীবন বেছে নেন। কিন্তু এই ঋষির আধ্যাত্মিক সাধনার প্রভাবকে বহুদূর ছাড়িয়ে যায় জাতীয় জীবন সম্পর্কে নির্দেশ করা তাঁর ধ্যান ধারণাগুলি। সেই সূত্রেই আজকের এই অমৃত মহোৎসবের প্রাক্কালে তাঁর চিহ্নিত পথেরই একটি অনুসরণ নজরে পড়বে। বর্তমানের এই উদ্‌যাপন ও প্রতিজ্ঞা আগামী ২৫ বছরে দেশের ভাগ্যকে দৃঢ় ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করবে। আর সেই জাতির ভাগ্য নির্ধারণের অভিযাত্রায় নিতান্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে ১৯০৯ সালের ১৯ জুন সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর ‘ঝালকোটিয়ায়’ দেওয়া ভাষণটি।

স্বরাজ কী তা বোঝাতে গিয়ে অরবিন্দ বলেছিলেন ‘We seek fulfillment of our life as a nation...’ আর আমাদের জাতীয় জীবনে এই সাফল্যকে চাক্ষুষ করতে, নিজেদের আলাদাভাবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে স্বদেশি। এই স্বদেশি আসবে বাণিজ্যে, উৎপাদনে, শিক্ষায়, আইনে, প্রশাসনে রাজনীতিতে। হ্যাঁ, এর প্রসারণ হবে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। প্রতিটি কাজের লক্ষ্য হবে স্বদেশমুখী। ভারতের এই বিবর্তন যে নিয়তি নির্দিষ্ট তা অন্তরের বিশ্বাস থেকে উচ্চারণ করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

আজকের একবিংশ শতাব্দীর যাত্রাপথে তাঁর অবলোকন হয়তো কিছুটা গর্বিত উচ্চারণ মনে হলেও যেমন ‘আমরা কোনো সাধারণ জাতি নই, আমরা দেশকে ঘিরে থাকা আমাদের পর্বতমালা ও নদীগুলির মতোই প্রাচীন। আমাদের অতীত এক বহুমুখী গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ইতিহাস যা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি কখনই অতিক্রম করতে পারবে না।’ এরও আগে তাঁর উত্তরপাড়া ভাষণে তিনি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার দৃষ্টিতে বলেন, ‘যখন বলা হয় সনাতন ধর্ম জাগবে, ভারত জাগবে... হ্যাঁ সেই উত্থান হবে ভারতীয় সনাতন ধর্মের উত্থান। যখন বলা হয় ভারত পুনর্বার মহানত্ব স্পর্শ করবে তার অর্থ সনাতন ধর্মই মহান হয়ে উঠবে... এই সনাতন ধর্মের পুনরুত্থানের কাজে সনাতন ধর্মই হবে নিয়ামক। এর দ্বারাই ভারতের হবে বিস্তার, সে সারা বিশ্বকে ছাপিয়ে যাবে। আমি জোর দিয়ে বলছি ধর্মের জন্যই এবং ধর্মের দ্বারাই ভারতের অস্তিত্ব প্রবহমান।’

তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীর ১১৩ বছর পর ভারতে প্রচলিত রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের যে অসামান্যতা ও জাতীয়তাবাদের অগ্রসরমানতার সংকেত তিনি দিয়েছিলেন তা কিছুটা উত্তেজক মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে যে মহাসম্মাননীয় তাঁর স্থায়ী আসন, জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে তাঁর যে অবিসম্বাদিত অবস্থান সেখানে তিনি ভারতকে ‘বিশ্বগুরুর’ আসনে দেখতে দৃঢ় সংকল্প। সেই হিসেবে এগুলিকে নিশ্চিতভাবেই সমসাময়িক মনে হয়। অবশ্যই চলতি ইতিহাস পাঠ্যক্রমের সঙ্গে তা হয়তো মেলে না।

এই সূত্রেই প্রধানমন্ত্রী যে অমৃত মহোৎসবের পরিকল্পনা নিয়েছেন তা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন নয়, তিনি বিশেষ করে প্রতিটি বাড়িতে ত্রিরঙ্গা উত্তোলনের মাধ্যমে নাগরিকদের উজ্জীবিত

> “অমৃত মহোৎসবের যাত্রাপথ দীর্ঘ। এটি শুরুর একটি বিন্দু যেখান থেকে বাহ্যিক উন্নয়নের গায়ে গা লাগিয়ে জেগে উঠবে এক আধ্যাত্মিক ভারত। সেই ভারত আর কোনোদিন কারুর অঙ্গুলি হেলনে চলবে না। সেই ভারত হবে না কোনো উপেক্ষা বা অবহেলা করার মতো দেশ।”

করতে চেয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই ভারতের অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত করে নিয়েই প্রয়োগ করবে। কিন্তু একথার মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যা বুক বাজিয়ে বলা যায় যে এবার ভারতের সময় এসেছে।

যখন অরবিন্দ তাঁর কথা বলেছিলেন তখন আপামর ভারতবাসী নিজেদের এক পরাজিত হতমান জনতা হিসেবে ভাবাটাই স্বাভাবিক বলে মনে করত। এই মানসিকতাটিই নোবেল বিজেতা নইপল অযোধ্যায় বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর বলেছিলেন 'এই কাজটি ভারতীয়দের তাদের অতীত মানসিকতা থেকে নবজীবন দেবে।'

নিজেদের সম্পর্কে এই প্রবহমান হীনমন্যতা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ১১ জুন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছিলেন, 'নিজেদের ভৃত্য মনে করার হীনমন্যতা ১২০০ বছর ধরে আমাদের সবিশেষ কষ্ট দিয়েছে। এর ফলে যখনই আমরা কোনো মান্যগণ্য ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছি তখন কিছুতেই মাথা উঁচু করে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারিনি।'

এই নিজেকে পিছিয়ে থাকা ভাবার অন্যতম কারণ অর্থনীতি ক্ষেত্রে সঠিক অগ্রগতির অভাব যাতে দেশের বিশাল গরিবশ্রেণীর কোনো উন্নয়ন হয়নি। আমরা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসেবে ভাঙা রাস্তা, ভিড়ে ঠাসা রেল সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। জনগণের ব্যবহারের সাধারণ স্থানগুলি সর্বদা নোংরা ও ভাঙাচোরা থাকত। এর ওপর ছিল জনজীবনে সর্বব্যাপী দুর্নীতির দাপট। সব থেকে বড়ো হয়ে উঠেছিল অপদার্থতা, অযোগ্যতা ও নিতান্ত সাধারণ মেধার লোকজনকে দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালানোর রীতি, এদেরই বড়ো করে দেখানো।

বিদেশে থাকা কিছু কিছু ভারতীয় চমকপ্রদ কাজ করলে আমরা বাহবা দিতাম। কিন্তু সেটি প্রধানত ব্যক্তিগত স্তরেই আটকে থাকত, নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসেবে ভারতের সঙ্গে তা যুক্ত হতো। তবুও, ২০১৪ সালই একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল এটা বললেও ভুল হবে। ৯০-এর দশকের শুরু থেকেই রাজনীতিতে কেমন একটা চোরাস্রোত বইতে শুরু করে অনিশ্চয়তার। ওয়াকিবহাল মহলের মনে হয় ভারত বোধহয় অন্ধ গলির দিকে চলেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এটা টের পান। বিভিন্ন রাজ্য নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের যে মডেল চালু ছিল যা নিশ্চিতভাবেই নেহরুর একটি চতুর চাল হিসেবে ৫০-এর দশক থেকে শুরু হয়, তার দম শেষ হয়ে আসছিল। এর পরিণতিতে জনমনে অতৃপ্তি ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। বিভিন্ন নির্বাচন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর প্রতিফলনও দেখা যায়। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরে হলেও এক ধরনের গণতন্ত্রীকরণের ধাঁচার প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু এই পরিবর্তন সামগ্রিক জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিণত ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল।

এই আসন্ন পরিবর্তনের পদসঞ্চার কিন্তু সাত সাতটি কেন্দ্রীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো একটি একক রাজনৈতিক দলের একক গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় পরিষ্কার হয়ে যায়। দেশ জোট সরকারের ভঙ্গুরতা ও অনিশ্চয়তার ওপর নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়। নরসিমহা রাও, অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিংহ এঁরা সকলেই ভালো মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের দেশের প্রতি আন্তরিকতায় কোনো খাদ ছিল না। কিন্তু জোট ধর্ম পালনের জন্য তাঁরা পূর্ণ কর্মক্ষম হতে পারেননি, তাঁদের হাত বাঁধা ছিল।

কিন্তু এই প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে জনতার যে বিপুল সমর্থন নিয়ে মোদী ক্ষমতায় আসেন তার গুরুত্ব নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। ২০১৯ সালে আরও প্রাঞ্জলভাবে জনতা তাদের মনোভাব প্রকাশ করে, সমর্থন আরও বর্ধিত করে। কিন্তু শুধু নির্বাচনী জয় ধরলে এই বিশ্লেষণ সরলীকৃত হয়ে যাবে। জনতার এই পূর্ণ নির্ভরতার মূলে আছে নির্দিষ্ট নেতার প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার প্রতি সমর্থন। সেই নেতার বিশ্বাসভূমির রূপ যার মধ্যে মানুষ খুঁজে পেয়েছে চির আরাধ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের স্বপ্নের রূপায়ণের দূরদৃষ্টির প্রতিফলন। আর এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি জওহরলাল নেহরু বা অন্যদের মতো আধুনিকতাবাদের অন্ধ অনুকরণ নয় কিন্তু এর মধ্যেও বিশ্বজনীনতার ছোঁয়া আছে।

বাস্তবে ২০১৪ সালে ভারত সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছে যেখানে একটি আমূল দিক ও দিশা পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় যার ফল আমরা এখন অনুভব করছি। অবশ্যই এটা দেশকে বহির্বিশ্ব থেকে গুটিয়ে নিয়ে কোথাও আবদ্ধ করে দেওয়া নয় যা অনেক মোদী সমালোচক বলছেন। এটি একেবারে অভাবনীয় গর্বের বিষয় যে আজকের বিশ্ব ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবে ভারতের নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে। আজকের ভারত অর্থনৈতিক ভাবে সমর্থ হয়ে উঠছে আর নাগরিকদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধের পুনরুত্থান ঘটে চলেছে। এই অমৃত মহোৎসবের যাত্রাপথ দীর্ঘ। এটি শুরুর একটি বিন্দু যেখান থেকে বাহ্যিক উন্নয়নের গায়ে গা লাগিয়ে জেগে উঠবে এক আধ্যাত্মিক ভারত। সেই ভারত আর কোনোদিন কারুর অঙ্গুলি হেলনে চলবে না। সেই ভারত হবে না কোনো উপেক্ষা বা অবহেলা করার মতো দেশ।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক)

শোকসংবাদ

মালদা জেলার সংস্কার ভারতীর সভাপতি ও স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি পরেশ সরকারের শাশুড়িমাতা শচী সরকার গত ৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। ৩ কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

স্বস্তিকা পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ও লোকপ্রজ্ঞার পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত মাতৃশক্তি প্রমুখ সুতপা বসাক ভড়ের পিতৃদেব এবং দ্বারহাট্টার স্বয়ংসেবক রাসবিহারী ভড়ের শ্বশুরমশাই প্রভাস চন্দ্র বসাক গত ১২ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ১ কন্যা, জামাতা, ১ নাতি, ২ নাতনি-সহ গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

অখণ্ড ভারতের প্রত্যাশা জাগাচ্ছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষ্যে 'হর ঘর তেরঙ্গা'র ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আহ্বানে শুধু দেশবাসীই নন, সাড়া দিল পাকিস্তানবাসীরাও। সেদেশের মুলতানের শাহিদা ইসলাম কলেজে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ অনুষ্ঠান, মডেল ইউ এন অনুষ্ঠানে থিম হিসেবে একদল ছাত্র-ছাত্রী বেছে নিয়েছিল ভারতকেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়োয় দেখা যায়, এক ছাত্র প্রথমে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে অনুষ্ঠান-মঞ্চে প্রবেশ করে। ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক বাজছে 'বন্দেমাতরম্'। সেই গানের সুরে ওই ছাত্রটিকে ভারতের পতাকা নাড়তেও দেখা যায়। শোরগোল পড়ে যায় অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মধ্যে। তড়িঘড়ি মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় ওই ছাত্রকে। তবে তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। ছাত্রটিকে নামিয়ে দেওয়ার পরই ভারতের থিমে সেজে একদল ছাত্রী মঞ্চে ওঠে। বেশ কিছু জনপ্রিয় হিন্দি গানের সঙ্গে তাদের পারফর্ম করতে দেখা যায়। পাকিস্তানি সাংবাদিক গুলাম আব্বাস শাহ নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে এই ঘটনার ভিডিয়ো শেয়ার করার পাশাপাশি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওই অনুষ্ঠানে যারা যারা নিজেদের থিম দেশ হিসেবে ভারতকে বেছে নিয়েছিল তাদের প্রত্যেককেই মঞ্চে পারফর্ম করতে বাধা দেওয়া হয় মূলত গণ্ডগোলের আশঙ্কায়। তবে দোর্দণ্ডপ্রতাপ পাকিস্তানি রাষ্ট্রশক্তির যাবতীয় ভীতিকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের আগামীদিনের একদল নবীন নাগরিক তাদের থিম দেশ হিসেবে ভারতকেই বেছে নিয়েছে।

এদিকে রবাব শিল্পী পাকিস্তানি নাগরিক সিয়াল খান ১৫ আগস্টের দিন তাঁর বাদ্যযন্ত্রে ফুটিয়ে তুললেন ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন-অধিনায়ক'-এর সুর। সিয়াল খানের পোস্ট করা ভিডিয়োর দেখা যাচ্ছে, নীলনীলিমায় ঢাকা অপূর্ব পার্বত্য ও প্রাকৃতিক

পরিবেশের মধ্যে বসে একমনে সে তার বাদ্যযন্ত্রটিতে 'জনগণমন'-এর সুর ফুটিয়ে তুলছে। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার বাসিন্দা পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র সিয়ালের সংগীতের প্রতি আগ্রহ ছোটোবেলা থেকেই। রবাব-শিল্পী হিসেবে তার কিছু নামডাকও আছে। সেই সূত্রেই ভারতের স্বাধীনতার দিনে সিয়ালের ওই বিশেষ প্রচেষ্টা। অন্যদিকে ভারতের বিদেশনীতি ও মাথা নত না করার অনমনীয় মনোভাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রিকেটার ইমরান খান। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লাহোরে লক্ষাধিক মানুষের এক জনসভায় দাঁড়িয়ে ইমরান খান স্লোভাকিয়ার ব্রাতিস্লাভা ফোরামে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের একটি ভিডিয়ো দেখান। যেখানে জয়শঙ্করকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমেরিকার উষ্মা প্রকাশ সত্ত্বেও তাদের রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি করার অন্যায্য অনুরোধ নাকচ করে দিয়ে ভারত জানিয়ে দেয় রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির ওপরে আমেরিকার কোনো ধরনের নাক গলানো বরদাস্ত করা হবে না। ইউরোপও রাশিয়ার থেকে গ্যাস কিনছে, ভারতও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তেল কিনবে। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই ভিডিয়ো দেখিয়ে ভরা পাকিস্তানি জনসভায় দাঁড়িয়ে জয়শঙ্করের প্রতিধ্বনি করে ইমরান বলেন— 'এই হলো স্বাধীন দেশের বিদেশনীতি। ভারত আমেরিকার কৌশলগত মিত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদেশের স্বাধীন বিদেশনীতি আমেরিকার রক্তচক্ষুর সামনে মাথা নোয়ায়নি।' এরপর নিজের দেশের সরকারের অবস্থানের তীব্র নিন্দা করে ইমরান বলেন, ভারত ও পাকিস্তান একই সময়ে স্বাধীনতা পেয়েছিল। ভারতে আজ গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু পাকিস্তানে তাঁদের মতো রাজনীতিকদের টিস্যু পেপারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজন মিটলেই ছুঁড়ে ফেলে দাও। তাই ভারত করে দেখালেও পাকিস্তান পারেনি। ইমরান বলেন, তিনি এই দাসত্বের বিরোধী।

এই যে পাকিস্তানি নাগরিকদের একাংশের এখন ভারতের প্রতি প্রেম জেগেছে, তথ্যাভিজ্ঞমহল এতে নরেন্দ্র মোদীর আমলে ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং কূটনৈতিক দৌত্যেরই সাফল্য দেখছে। তাঁরা মনে করেন, এর ফলশ্রুতিতে আগামীদিনে পাক-মোল্লাবাদের ভয়াবহ ভারতবিরোধী রূপকে সংযত করার চেষ্টায় সাফল্য আসবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। যদিও ভারতের জাতীয়তাবাদী নাগরিকরা আরেকটু আশাবাদী হতে চাইছেন। এই আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দ। তিনি বলেছেন, খণ্ডিত ভারত আবার অখণ্ড হবে। ১৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিনের প্রাক্কালে আজও দেশবাসী 'অখণ্ড ভারত দিবস' পালন করেন। এখন আমাদের কাছে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি থেকে অখণ্ড জার্মানি হওয়ার উদাহরণও রয়েছে। '৪৭-এ ব্রিটিশের চক্রান্ত যে ভবিষ্যতে ধুলোয় মিশে যাবে না তাই-বা কে বলতে পারে? ইসলামাবাদ যদিও এখনো অনেক দূর, কিন্তু আশার ঝলক দেখিয়ে গেল ভারতের 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' ও 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি। □

প্রেম ও প্রত্যয়ের আবহমান পরম্পরা

নিখিল চিত্রকর

ভারতবর্ষ এক সুসংহত রাষ্ট্রের ধারণা। শুধুমাত্র একটা ভৌগোলিক সীমানা ও সে সময়ের প্যারামিটার দিয়ে এই উপমহাদেশীয় ভূখণ্ডকে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। এর বিস্তার বা ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারিত। রাজা ভরতের নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হলেও বহু পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের ধারণা আসলে সমস্ত বিশ্বের রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

শাসন নীতি, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, জাতীয় স্বার্থ ও সর্বোপরি পররাষ্ট্রনীতির মতো নির্ধারিত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্রের ভিত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে রাষ্ট্র পরিচালনার উল্লিখিত সমস্ত নীতিগুলিই সুবিন্যস্তভাবে পালন করেছেন তৎকালীন শাসকেরা। ঋষভদেবের পুত্র ছিলেন রাজা ভরত। সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ডে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরাক্রমশালী রাজা ভরত শাস্ত্রবর্ণিত সমস্তরকম যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তীরে। ভরতের বংশধর মহারাজ কুরু। কুরুর চতুর্দশ বংশধর মহারাজা শান্তনু। তাঁর তিন পুত্র। দেবব্রত (ভীষ্ম), বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ। এই বিচিত্রবীর্যের বংশধররা কৌরব ও পাণ্ডব। সেই কালচক্রে কৌরব-পাণ্ডব এবং তাঁদের কেন্দ্র করে চেদি, পাঞ্চাল প্রভৃতি ছোটো ছোটো জনপদের শাসকদের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। যার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের মহাভারত মহাকাব্যে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী যথার্থ বলেছিলেন, তাঁর স্বরচিত কবিতায়— 'ভারত কোনও ভূমির টুকরো নয়। চিরঞ্জীবী এক রাষ্ট্রপুরুষ। ভারতীয়রা কেউ এদেশকে 'ভারতমাতা' বলে স্তুতি করেন, কেউ বন্দনা করেন রাষ্ট্র পুরুষের নৈবেদ্য রূপে। প্রকারভেদ যাই হোক না কেন, ভারতের আপামর নাগরিক সন্তানের কাছে ভারত যে 'দেবত্বে' উন্নীত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। শ্রীশ্রী চণ্ডীর শ্রীদেব্যথর্ব শীর্ষম্-এ স্বয়ং মহামায়া বলছেন, 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং চিকিতুষী প্রথম যজ্ঞীয়ানাম্' অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের চরাচরে আমারই জগদীশ্বরী প্রত্যয় ব্যাপৃত রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার অনেক স্তোত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'ভারত' সম্বোধন করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের 'ভারত' সম্বোধনে বিশ্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের জ্ঞান যোগে সপ্তম শ্লোকে যখন ভগবান বলেন, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্— হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। এক্ষেত্রে ভারত কোনও ভৌগোলিক সীমামাত্র নয়, অখণ্ড বিশ্বময় তার স্থিতিকে নির্দেশ করে।

কখনও ত্রিশূলধারী শংকর আবার কখনও বংশীবাদক কৃষ্ণ, কখনও সুদর্শন চক্রধারী ভগবান বিষ্ণু— সর্বময় বিশ্বরূপ এই হরিহরাই রাষ্ট্রপুরুষের অন্তরাত্মায় অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই আমাদের ভারত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের অধিকর্তা— 'জিতা, জাগতা, রাষ্ট্রপুরুষ'।

ভারতীয় সভ্যতা তার প্রাচীনত্বের শুরু থেকেই অধ্যাত্মবোধের চারণ ভূমিতে অন্তরাত্মা সমর্পণ করেছে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের দেশীয় রাজারা নিজেদের সাম্রাজ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অদম্য প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখেছেন। তা সে মৌর্য বংশ হোক বা গুপ্ত বংশ। পাল বংশ হোক বা সেন বংশ। সত্যকে রক্ষা করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'— নীতিতে আস্থা রেখেছিলেন। দুষ্টের দমন করতে গিয়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের মাটি যেমন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শোণিতে সিক্ত হয়েছে, তেমন সম্রাট অশোকের মতো ভারতীয় অধিপতি মানব কল্যাণের স্বার্থে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও পৌঁছে গেছে ভারতবর্ষের শান্তির বাণী।

সুদূর অতীত থেকেই বহির্বিশ্বের কাছে ভারতের স্বতন্ত্র একটা ইমেজ আছে। ভারত 'শান্তির দূত'। ভারতের মসনদে শাসক সরকারের রং পরিবর্তন হয় ঠিকই। কিন্তু তার শান্তিকামী ইমেজ অক্ষত থাকে। এবং চিরকাল থাকবে। অতি সম্প্রতি তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে রশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে। দুই বিবদমান দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে যখন গোটা বিশ্বের চোখ ক্রিমিয়ায় নিবদ্ধ, ঠিক সেই সময় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনেস্কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। বললেন, 'একমাত্র ভারতের মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধ থামতে পারে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।' যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একজন বিদেশি প্রেসিডেন্টের ভারতের উপর এমন আস্থা আসলে বিশ্বের দরবারে এদেশের শান্তিকামী পরিচয়কে মজবুত করে। আবহমানকাল ধরেই ভারত শিষ্টের পালন করে এসেছে। এদেশের সাংস্কৃতিক ধারা, শিক্ষার উৎকর্ষতা, কখনও-বা বিজ্ঞানের দুরূহ গবেষণা বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন কোণে পৌঁছে গেছে। প্রচার বিমুখ

ফঃ ২

ভারতীয় পণ্ডিত, ঋষিকুলের অসাধ্য সাধনার সেই সব পুঁথিও দেশছাড়া হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় শাসকরা কখনও ভারতের বাইরে উপনিবেশ গড়ে, পরাধীনতার পাঁচিল তুলে শোষণ, নিপীড়ন চালিয়েছে, একথা শোনা যায়নি। তার কারণ এদেশের সনাতন প্রকৃতি। সহনশীলতা, ধৈর্য, স্থৈর্য ও দৃঢ়তার মাধ্যমে স্বস্থান বজায় রাখার অদ্ভুত গুণ আছে এদেশের মাটিতে। কবি সুনির্মল বসুর, 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিতে উদ্ধৃত— পাহাড় শিখায় তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন-মহান/খোলা মাঠের উপদেশে দিল-খোলা হই 'তাই রে।' 'মৌন-মহান' ও 'দিল খোলা' বিশেষণেই ভারতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। রামায়ণে রাম-সীতা-লক্ষ্ম ণের বনবাসকালে যাত্রাপথে একটি জঙ্গল পড়ে। শ্রীরামচন্দ্র সেই জঙ্গলের প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণকে বলেন, জনৈক অগস্ত্য মুনির অনুমতি নিয়ে আসতে। লক্ষ্মণ অগস্ত্য মুনির কাছে অনুমতি চাইতে গেলে তিনি মুখের উপর তর্জনী রেখে ইঙ্গিত করেন, 'জিহ্বায় নিয়ন্ত্রণ থাকলে সারা বিশ্ব জয় করা যায়।' ভারতই এখন একমাত্র রাষ্ট্র, যার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই প্রাচীন মহাকাব্য, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী অনুসৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বিভিন্ন সময়ে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে ভারতবর্ষের উপর। তাই বোধহয় সময়ের ব্যবধানে বহু পাঠান, তুর্কি, মোগল ও ব্রিটিশদের মতো বহু লুটেরা এদেশে এলেও তাদের রাজত্ব টিকে থাকেনি। যেভাবে তারা এসেছিল সেভাবেই তাদের চলে যাওয়া নির্ধারিত ছিল। এক সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ওরা কাজ করে' কবিতায় ব্রিটিশদের নিয়ে সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলেছিলেন— 'জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল/কোথায় ভাসায়ে দেবে দেশ কাল সাম্রাজ্যের বেড়াজাল।' এ দর্শনোপলব্ধি আসলে ভারতের অধ্যাত্মবোধের অণু-পরমাণু থেকে উৎসারিত। অধ্যাত্মবোধই ভারতের মূল চাবিকাঠি। যার মাধ্যমে শত্রুকে মিত্র পক্ষে টেনে নেওয়ার মতো দৃষ্টান্তও লিপিবদ্ধ হয়। প্রাচীন ভারতের পৌরব রাজ্যের রাজা পুরু আলেকজান্ডারের ভারত বিজয়ের স্বপ্নে কুঠারাঘাত করেছিলেন। অমিত বিক্রমে তিনি গ্রিক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শত্রু আলোকজান্ডারের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে দেননি। বলা হয়, রাজা পুরুর অপরাজেয় ক্ষমতার কথা শুনে আলেকজান্ডারের স্ত্রী রোক্সেনা তাঁকে রাখি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যেন আলেকজান্ডারের প্রাণ রক্ষা করেন। তাই হয়েছিল। কিন্তু আলোকজান্ডার পুরুর অদম্য সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের একজন ছোটো রাজার এই মানবিক দর্শন আসলে সর্বব্যাপী ঈশ্বর অনুভূতির রাজপথকে চিহ্নিত করে। এই দর্শন বোধকেই 'একাত্ম মানবদর্শন' ধারণায় গ্রন্থিত করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

এদেশের মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে মুরলীধর বলে ডাকে। ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ রূপে দুষ্টের দমনের উদ্দেশ্যে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাঁশির মনমোহিনী সুরে তিনি ত্রিভুবন মোহিত করে রাখতেন। তাঁর প্রেমের সুরমূর্চ্ছনা নর-নারীকে পাগলপারা করেছিল। দুর্যোগের সময় ব্রজে ভগবান কৃষ্ণ কড়ে আঙুলে গোবর্ধন পর্বত মাথার উপর তুলে নিয়ে তার তলায় হাজার হাজার ব্রজবাসীকে নিরাপদ আশ্রয় করে দিয়েছিলেন। ভক্তের ডাকে তিনি সহায় হন। কৃষ্ণবর্ণ এই যদু অবতার ভক্তের সহায় থাকেন সর্বদা। আবার তিনি প্রজাপীড়ক রাজা কংসকে বধ করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ভগবান কৃষ্ণের আত্মিক দর্শন।

'রাষ্ট্রপুরুষ' ভারতের স্বরূপটিও পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত প্রকাশিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। ভারত অতিথি পরায়ণ, প্রেম-বাণীর প্রচারক, শান্তিকামী। তাঁর শাস্ত্রীয়, রাগরাগিণী সম্মিলিত সংগীতের আলাপ, অন্তরা থেকে সঞ্চারী— প্রতিটি ছত্রেই প্রশান্তির তরঙ্গ খেলে যায়। কিছু প্রতিবেশী দেশের চরম অরাজক আচরণের দিনেও ভারত ধৈর্যের পরিচয় দেয়।

অবশ্য সেই ধৈর্যকে কেউ কেউ দুর্বলতা ভেবে বসে। তাই কখনও পাকিস্তান বা চীনের মতো দেশ নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ভারতের ভূখণ্ডে কবজা জমাতে চায়। তাদের ভুলে গেলে চলবে না ভগবান কৃষ্ণ সদৃশ এই ভারত যে হাতে বাঁশি বাজিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের সুর শোনায়, সেই হাতেই সুদর্শন চক্র দিয়ে শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করতে পারে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী, অটলবিহারী বাজপেয়ীর পর তেমন বলিষ্ঠ দেশনায়ক পায়নি ভারত। দীর্ঘ সময় পরে ২০১৪ সালে এদেশের প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী। যাঁর উত্থান ও কার্যকালকে সমীহের চোখে দেখছে গোটা বিশ্ব। প্রথম দুই রাজনেতার মধ্যে শত্রুপক্ষের চোখে চোখ রাখার সাহস ছিল। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মাত্র ১৯ মাসের প্রধানমন্ত্রিত্বে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের লক্ষ্য ছিল পুরো কাশ্মীরটাই দখল করা। কিন্তু লালবাহাদুর শাস্ত্রীর হুংকারের মুখে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল আয়ুব। ১৯১৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়ে কার্গিল যুদ্ধের সূচনা হয়। এবারও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ প্রথম যুদ্ধের সূচনা করে। অটলবিহারী বাজপেয়ী তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকে জানিয়েছিলেন, 'পাকিস্তান ভারতে পরমাণু হামলা চালালে দেশের কিছুসংখ্যক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হবে। কিন্তু পরেরদিন থেকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পাকিস্তান দেশটাই মুছে ফেলবে ভারত' —এ ছিল সুদর্শন চক্রধারী ভারতের আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিফলন।

সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদীর কার্যকালে একদিকে যেমন ভারত বহির্দেশে ত্রাণ পাঠাচ্ছে, বিবদমান দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করার উদ্যোগ নিচ্ছে, করোনার প্রতিষেধক ও খাদ্যপণ্য পাঠিয়ে অন্যান্য দেশকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করছে, তেমনই পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও গালওয়ান সীমান্ত থেকে লাল চীনের সেনাদের পিছু হঠতে বাধ্য করে তাঁর সংহারক রূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর কবিতায় উদ্ধৃত— 'ইসকা কংকর কংকর শংকর হ্যায়।' কখনও ত্রিশূলধারী শংকর আবার কখনও বংশীবাদক কৃষ্ণ, কখনও সুদর্শন চক্রধারী ভগবান বিষ্ণু— সর্বময় বিশ্বরূপ এই হরিহরাই রাষ্ট্রপুরুষের অন্তরাত্মায় অন্তর্নির্হিত রয়েছে। এই আমাদের ভারত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের অধিকর্তা— 'জিতা, জাগতা, রাষ্ট্রপুরুষ'। □

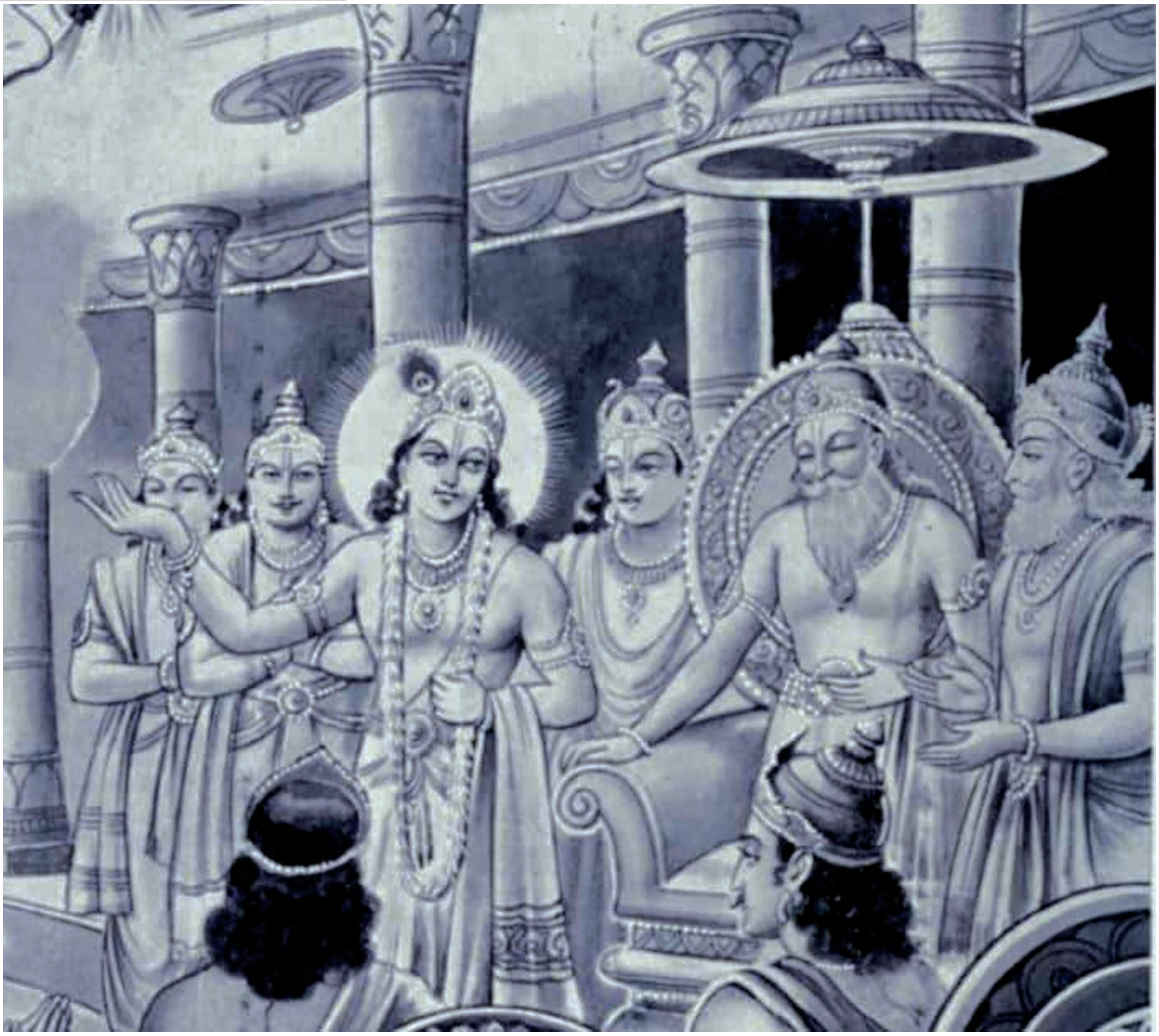

পরমাণু যুদ্ধ এড়াতেই কি মাত্র পাঁচ গ্রামের প্রস্তাব করেন কৃষ্ণ

দুর্গাপদ ঘোষ

মহাভারত এবং তাঁর প্রাণপুরুষ লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে এখনও যাঁরা নিরন্তর গবেষণা, বিচার ও বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন তাঁদের অনেকে একটা ঘটনা সম্পর্কে কিন্তু ধন্ধ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। সেটা হলো রাজত্বের অধিকার নিয়ে পাণ্ডবদের হয়ে দৌত্য করতে গিয়ে অতি আপোশ মনোভাব যা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে কোনওভাবেই মেলানো যায় না। এটা তো নিতান্ত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নয়! কৃষ্ণের সমগ্র জীবন শৌর্য-বীর্য, ক্ষত্রিয়সম, আপোশহীন সংগ্রামী মানসিকতার তেজস্বিতায় ভরা। অথচ পাণ্ডবদের মতো শূরবীরদের জন্য শেষ পর্যন্ত মাত্র পাঁচখানা গ্রাম পেতে যেভাবে অনুনয় বিনয় করতে দেখা গেছে তার সঙ্গে কৃষ্ণচরিত্রের তীক্ষ্ণতার কোনও সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কৌরব রাজসভায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে পাণ্ডবদের জন্য তিনি তো অর্ধেক রাজত্বই দাবি করেছিলেন। তাহলে কী এমন হলো যে দিনের শেষে মাত্র পাঁচখানা গ্রামের দাবিতে এসে দাঁড়ালেন? নিজের

বলবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, কোনওকিছু সম্পর্কেই তো তাঁর মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা ছিল না। নিজের সম্পর্কে তিনি এতটাই জ্ঞাত ছিলেন যে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন— নরানাঞ্চ নরাধিপম্। নরকুলে নরাধিপ তিনি। মনুষ্যকুলে তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন গোলকাধিপতি মহাবলবান মহাধীমান বিষ্ণুর নরাবতার। অতি উচ্চমার্গের মনুষ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর অনুভূতি ক্ষমতা, অনুমানশক্তি, যে কোনও ঘটনার পূর্বাপর পরিণতি সম্পর্কে ছিল অসাধারণ বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা। মূষলপর্বে আমরা তাঁর সেই বৈজ্ঞানিক মেধার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। এই পর্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর পরই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে অতঃপর প্রবল জলস্ফীতি ঘটবে এবং আগামী ৩৬ বছরের মাথায় দ্বারকা নগরী জলমগ্ন হয়ে আরব সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। বাস্তবে ঘটেওছিল তাই। পিতামহ ভীষ্মের মতো মহাবীর ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক তাঁকে ‘পুরুষোত্তম’, ‘ঋষিকেশ’ বলে সর্বসমক্ষেই মান্যতা দিয়েছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অন্তে পুরুষোত্তম হিসেবে যজ্ঞার্ঘ্য সম্প্রদান করার সময় পিতামহ তো বলেই দেন— তেজ, বল, পরাক্রম ও দূরদর্শিতায় বৃষ্ণিকুলসম্ভব বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ। যে মানুষটার জীবন একেবারে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় রাক্ষসী পুতনা বধের মধ্যে দিয়ে আদ্যান্ত আপোশহীন সংগ্রামে পূর্ণ, কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যিনি মহাপরাক্রমী মথুরাধীশ কংসকে তার রাজসভার মধ্যেই নিধন করেন, যিনি ছিলেন অন্যায়, অনাচার, দুরাচারের বিরুদ্ধে কালান্তক বিগ্রহ— সেই কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে কুরুরাজসভায় প্রবেশের পর থেকেই নিগৃহীত, অপমানিত হয়েও মাত্র পাঁচখানা গ্রামের জন্য অনুরোধ-উপরোধ করে গেলেন। এ যেন জলে পাথর ভাসার মতো অবিশ্বাস্য। কিন্তু কেন? যুদ্ধের ভয়? শ্রীকৃষ্ণের? যুদ্ধ তো তিনি নিজের জীবনেও কিছু কম করেননি। রাজসূয় যজ্ঞস্থলে শিশুপাল হত্যার প্রাক্কালে ভীষ্ম তো উপস্থিত প্রত্যেকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে জানিয়ে দেন, এখানে এমন একজন রাজাকেও দেখছি না যিনি কৃষ্ণের কাছে যুদ্ধে পরাভূত হননি। —‘অস্যাং হি সমিতৌ রাজ্ঞামেকমপ্যজিতং যুধি। ন পশ্যামি মহীপালং সাত্বতীপুত্র তেজসা।।’

তাছাড়া যাঁদের দূত হিসেবে কুরুরাজের কাছে গিয়েছিলেন তাঁরাও কেউ নির্বীর্য ছিলেন না। যুদ্ধ তাঁরা নিজেরাও অনেকবার করেছেন। মহাবিক্রমে জয়ীও হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের মতো অতুলনীয় ভল্লসঞ্চালক, মধ্যম পাণ্ডব ভীমের মতো হস্তিবলতুল্য গদা প্রহারক ছাড়াও অর্জুনের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বীরদেরই তো প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলেন তিনি।

এটা ঠিক, কৃষ্ণ জানতেন যুদ্ধ বাধলে মহাবীর কর্ণ তো বটেই, হস্তিনাপুরের রাজানুগ্রহে পুষ্ট পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা প্রমুখ মহারথীরা কৌরবদের পক্ষেই অস্ত্র ধরতে বাধ্য হবেন। ভীষ্ম তো বারবারই বলেছেন, অহম্ বিবশামস্ত্ত। আমি নিরুপায় বিবশ। কিন্তু কৃষ্ণ তো এটাও জানতেন সে ভীমার্জুনদের সম্মুখ সমরে পরাস্ত করা কারও পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া জয়-পরাজয়, পরিণতি যাই হোক না কেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম, রাজধর্ম। তিনি নিজেই অর্জুনকে বলছেন যুদ্ধে জয়ী হলে সাম্রাজ্য লাভ করবে আর মৃত্যু হলে বীরগতি প্রাপ্ত হয়ে লাভ করবে অখণ্ড স্বর্গসুখ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বীরের জন্য যুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয়ে প্রাপ্তি কেবল লাভই। তাহলে সেই যুদ্ধ পরিহার করতে তিনি প্রায় সর্বংসহা হয়ে মাত্র পাঁচখানা গ্রামের জন্য অনুনয় বিনয় করতে গেলেন কেন? এই ‘কেন’-র উত্তর কি তাহলে ব্রহ্মাস্ত্র? যাকে এখনকার কোনও কোনও বিজ্ঞান গবেষক Low intensity-র পরমাণু অস্ত্র বলে চিহ্নিত করছেন! দক্ষিণ ভারতের একজন পরমাণু বিজ্ঞান গবেষক যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিয়ে অনেক বছর গবেষণা করেছেন, রীতিমতো জোরের সঙ্গেই জানিয়েছেন, ‘nuclear war happned in Mahabharata’— ‘মহাভারতে পরমাণু যুদ্ধ হয়েছিল।’

কী সাঙ্ঘাতিক দাবি! পরমাণু যুদ্ধ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে! এককথায় অনেকেরই চোখ বিস্ফারিত হতে পারে। পিলে চমকে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে। কেননা, ১৯৪৫-এ জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই অস্ত্রের ফলিত প্রয়োগের আগে এর বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে বর্তমান বিশ্ববাসীর প্রায় কোনও ধারণাই ছিল না। এমনকী ধারণা ছিল না আধুনিক পরমাণু বোমার জনক হিসেবে পরিচিত পরমাণু বিজ্ঞানী জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমারেরও।
হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসকাণ্ড দেখে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক এই পদার্থবিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কৃত আণবিক বোমার সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে ব্যবহৃত ‘ব্রহ্মাস্ত্র’-এর তুলনা করেন।
ওপেনহাইমারের এই তুলনাকে সামনে রেখে তাই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মহাভারতের যুদ্ধের ব্রহ্মাস্ত্র কি তাহলে পরমাণু অস্ত্র ছিল? তার ধ্বংস ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত এবং বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল বলেই কি কৃষ্ণ যেভাবেই হোক যুদ্ধটা যাতে এড়ানো যায় তার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন? অন্যথায় বীরদর্পী শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামী চরিত্রের সঙ্গে এহেন আপোশকামী শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে তো কোনওভাবেই এক পঙ্‌ক্তিতে ফেলা যায় না, এক নিক্তিতে মাপাও যায় না।

অন্য মতও অবশ্যই অনস্বীকার্য এবং এতদিন মুখ্যত সেটাই প্রতিপাদ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কূটনৈতিক রাজনীতির প্রজ্ঞাবান পুরোধা শ্রীকৃষ্ণ খুব ভালোই জানতেন যে পাঁচখানা গ্রাম কেন, পাঁচগজ জমি চাইলেও দুর্যোধন তা দিতে রাজি হবেন না। আর ধৃতরাষ্ট্র কুরুরাজ হলেও দুর্যোধনের ওপর তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই। সেজন্য মাত্র পাঁচখানা গ্রাম

রাজস্থানের মরুভূমিতে পড়ে থাকা 'ডেসার্ট গ্লাস ফরমেশন'। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এই ধরনের অবশেষ পাওয়া যায়।

চেয়ে দুর্যোধনকে কূটনৈতিকভাবে একঘরে করে ফেলেছিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অসাধারণ প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। এটাকেই কৃষ্ণচরিত্রের গবেষকরা প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত ও প্রস্তাবিত করে এসেছেন। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার যেসব ফল জানতে পারা যাচ্ছে তাতে বৈজ্ঞানিক মেধায়ও শ্রীকৃষ্ণ কোন শীর্ষমার্গে অবস্থান করতেন তারও প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করছেন অনেক গবেষক। এবং তাঁরা সবাই কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নন, বরং বেশিরভাগই বিজ্ঞান গবেষক। তাঁদের মধ্যে অন্তত দুজন পৃথিবীবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদের নাম করা যেতে পারে। স্বনামধন্য ওসেনোলজিস্ট বা সমুদ্র প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. এস আর রাও এবং ড. ব্রজবাসী (বি বি) লাল। ড. রাও আরব সাগরে নিমজ্জিত দ্বারকা নগরীর আবিষ্কার করে তাকে শ্রীকৃষ্ণের পত্তন করা দ্বারকার ধ্বংসাবশেষ বলে দাবি করেছেন। আর ড. বি বি লাল তো কোনওরকম রাখঢাক না করেই বলেছেন, মহাভারতে যা যা লিপিবদ্ধ রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে তার সবই সত্যি এবং সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা। ড. লালের নিজের ভাষায় 'combined evidences of archeology and literature establishes the historisity of Mahabharata... to be faithful, everything in the epic is true.' ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লি) পুরাখনন চালানোর পর ১৯৫৫ সালে তিনি এই দাবি করেন। বলা বাহুল্য, ড. রাও এবং ড. লালের মতো গবেষকদের এই সমস্ত ঘোষণার পর মহাভারতের এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন বা সন্দেহের আর কোনও অবকাশ থাকে না।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মহাভারত থেকে আমরা যে চিত্র পাই তাতে দেখি আলোচনান্তে দিনের শেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজসভা ছেড়ে বিদুরের গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করতে রওনা দিচ্ছেন তখন তাঁর চিরপরিচিত সদা প্রসন্ন মুখটা যেন পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল। কূটনৈতিক সাফল্যের প্রসন্নতাই যদি হতো তাহলে তাঁর মুখে তো অতি পরিচিত স্মিত হাসি থাকার কথা ছিল, অমন মুখভার হওয়ার কথা তো ছিল না। মুখের সেই থমথমে ভাবটা তার পরদিনও যথাযথ বজায় ছিল। সেদিন হস্তিনাপুর ত্যাগ করে তিনি যখন উপপ্লব্যের দিকে যাত্রা করলেন তখন পথিমধ্যে কর্ণের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ও সেই থমথমে ভাবটা কাটেনি। সমগ্র মহাভারত ঘাঁটলে কৃষ্ণের এরকম মুখভার প্রতিবিম্ব আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ তাঁর মতো স্থিতধী পুরুষ ভূ-ভারতে আজও আবির্ভূত হননি। কৌরব রাজসভায় প্রথম থেকে তাঁর সঙ্গে যে অভব্য আচরণ করা হয়েছিল তাতে তাঁর মুখমণ্ডল অমন ভারাক্রান্ত হওয়ার কথা নয়। তার আগে চেদিরাজ শিশুপাল তাঁকে লোকসমক্ষে কিছু কমবার কটূক্তি করেননি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে কখনও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়নি। কেবল স্মিত হেসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন কতবার হলো। কারণ তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। সব কিছুরই অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাছাড়া কুরুরাজসভায় তিনি তো নিজের জন্য কিছু চাইতে যাননি। গিয়েছিলেন পাণ্ডবদের হয়ে দৌত্য করতে।

অতএব, প্রতিপক্ষ কী বললেন, কী আচরণ করলেন সেটা ছিল যাঁদের হয়ে দৌত্য করতে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণভাবে তাঁদের মান-সম্মানের ব্যাপার। কোনও দৌত্যক্রিয়ায় আলোচনার নিষ্কর্ষের দায় কোনও দূতের ওপর বর্তায় না। তাহলে কৃষ্ণ কি সেই আশঙ্কাই করেছিলেন এখনকার কিছু বিজ্ঞান গবেষক যা বলছেন— পরমাণু যুদ্ধ? মহাপ্রলয়, মহাবিনাশ? উপপ্লবে ফিরে সেখানে অবস্থানকারী পাণ্ডবদের নিয়ে তিনি যখন দৌত্যক্রিয়ার ফলাফল নিয়ে আলোচনায় বসলেন তখনও তাঁর মুখভার কাটেনি। প্রায় কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ সব নীতিই প্রয়োগ করেছি কিন্তু যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেল না। কৃষ্ণের মতো মহাপরাক্রমী, সর্বজ্ঞাত অন্তর্যামী পাণ্ডবদের মতো শূরবীরদের যখন বিমর্ষভাবে বলেন, 'যুদ্ধটা এড়ানো গেল না' তখন বুঝতে হয় ওই মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা নিয়ে লীলাময়ের অন্তরে কতখানি তোলপাড় অবস্থা চলতে পারে। এর আগে কোনও যুদ্ধ কৃষ্ণকে এভাবে বিচলিত করেছে সারা মহাভারত ঘাঁটলে এরকম কোনও উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু নিতান্ত কয়েকজন অপরিণামদর্শী বালখিল্য দাম্ভিকের পরমাণু যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ঘোরতর অজ্ঞানতার কারণে মানব সমাজ, নিরীহ প্রাণীকুল, তিলে তিলে গড়ে ওঠা সভ্যতা এক লহমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক কৃষ্ণের মতো পরমপুরুষ সে সময় হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তা মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন সজ্জনদের পরিত্রাণকারী, ধর্মের সংস্থাপক। দুষ্কৃতীদের বিনাশ করে সজ্জনদের ধর্মাশ্রিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধরাধামে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু দুর্জনদের বিনাশ মানে তো সজ্জনদের সমুহ সর্বনাশ নয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতিতে অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে সেটাও দেখতে পাচ্ছিলেন।

রাজস্থানের ঝুনঝুনুর কাছে পিলানি বিড়লা ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী তথা পরমাণু গবেষক শ্রীনিবাসন এস ভি ২০১৫ সালের ৩০ মে যেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কুরুক্ষেত্র সম্পর্কে জোরালো দাবি করে জানিয়ে ছিলেন, 'Yes, nueclear war happend in Mahabharata' সেদিন মহাভারত গবেষকদের আন্তর্দৃষ্টিতে যেন আর একটা হিরোশিমা-নাগাসাকির মতো মহাবিনাশের ছবি ফুটে উঠল। কিন্তু সাংবাদিকরাও ছাড়বার পাত্র নন। জানতে চাইলেন কীসের ভিত্তিতে, কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের জোরে এতবড়ো দাবিটা প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন তিনি? কালবিলম্ব না করে গবেষকের উত্তর ছিল— তা নাহলে হরিয়ানা, পঞ্জাব, করাচি এবং তার আশপাশের এলাকায় বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে তীব্র মাত্রার পরমাণু বিকিরণ লক্ষ্য করে যেতে থাকবেন কেন? প্রসঙ্গত, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এই সমস্ত এলাকা কুরু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাকে সর্বিকভাবে কুরুক্ষেত্র বলা হতো। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে এর উল্লেখ মেলে। বর্তমানে হরিয়ানায় অবস্থিত কুরুক্ষেত্রের অবস্থান সম্পর্কে জানাতে গিয়ে মহাভারতের আদিপর্বে ব্যাসদেব লিখে গেছেন—

'দক্ষিণেন সরস্বত্যা উত্তরেণ দৃষদ্বতীম্।

যে বসন্তি কুরুক্ষেত্র তে বসন্তি তরিবিষ্টপে।।'

এই বর্ণনা অনুযায়ী বর্তমান কুরুক্ষেত্রের অবস্থান ছিল বৈদিক নদী সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীর মাঝামাঝি এলাকায়। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ হলেও এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে অধুনালুপ্ত অথবা অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদী কোনো কাল্পনিক ধারণা বা মিথ নয়। এক সময় তা সত্যি সত্যিই প্রবাহমনা ছিল। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব থেকে জানা যায় যে মাত্র ১৮ দিনের ওই মহাযুদ্ধে অসংখ্য মানুষ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক হাতি-ঘোড়া এবং অন্যান্য নিরীহ প্রাণীর মৃত্যু ঘটেছিল। ধ্বংস হয়েছিল বিপুল পরিমাণ সম্পদ। সমুদ্রে জলস্ফীতি ঘটে ডুবে গিয়েছিল আটলান্টিক মহাসমুদ্রে 'অ্যাটলান্টিস' এবং আরব সাগরে অবস্থিত দ্বীপনগরী দ্বারকার মতো অতি উন্নত নগর সভ্যতা। উল্লেখিত প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য বিজ্ঞান গবেষকদের মতে পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ ব্যতিরেকে এটা ছিল প্রায় অসম্ভব ঘটনা।

তাছাড়া কুরুক্ষেত্রে পুরাখনন চালিয়ে পুরাতাত্ত্বিকরা যে সমস্ত প্রত্নবস্তু যেমন কয়েকটা রথ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন সেগুলি কুরুক্ষেত্র সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। সেসব থেকে এখনও নিরন্তর radioactive radiation বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হচ্ছে। কার্বন ডেটিং পরীক্ষায় সেসবের বয়স নির্ধারিত হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর। এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যাপারটা হলো এই রকম— কোনো প্রত্নবস্তু যার মধ্যে জৈব পদার্থ যেমন মানুষ কিংবা অন্যান্য জীবজন্তুর হাড়গোড়, চামড়া, গাছগাছালির টুকরো, ছাল ইত্যাদির ফসিল বা প্রস্তরীভূত বস্তুর মধ্যে বিশেষ জাতের কার্বন পরমাণু থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় কার্বন-১৪। এই জাতীয় কার্বন তেজস্ক্রিয় অর্থাৎ আলোক বিকিরণ করতে করতে তিলে তিলে ক্ষয়ে যায়। এরকম কোনো প্রত্নবস্তুতে এই তেজস্ক্রিয় কার্বন কী পরিমাণে অবশিষ্ট আছে তা মেপে কত সময় ধরে তা ক্ষয়ে চলেছে সেটা নির্ধারণ করা যায়। এইভাবে প্রায় সঠিকভাবে জানা যায় সেই প্রত্নবস্তুর বয়স কত। কুরুক্ষেত্রে পরমাণু যুদ্ধ হয়েছিল বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেছেন তাঁরা এই কার্বন ডেটিং পরীক্ষাকেও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করছেন।

ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়াও মহাভারতের ওই যুদ্ধে আরও যেসব মারাত্মক অস্ত্র (সম্ভবত আণবিক অস্ত্র) ব্যবহৃত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা হলো পাশুপতাস্ত্র, নাগাস্ত্র, ব্রহ্মাশিরোনামাস্ত্র, বায়বাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বজ্রাস্ত্র, বরুণাস্ত্র ইত্যাদি। তবে ওপেনহাইমার কেবল ব্রহ্মাস্ত্রর নামই

করেছেন, ব্যাসদেবের সুরে সুর মিলিয়ে তাকে 'বিশ্বধ্বংসী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মহাভারতের রচয়িতা নিজেই ব্রহ্মাস্ত্রকে 'বিশ্বধ্বংসী' রূপে আখ্যাতি করে গেছেন। ঐতিহাসিক কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীর এক বক্তব্য থেকে জানা যায় যে হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসতাণ্ডব দেখে ওপেনহাইমার এই বলে মন্তব্য করেছিলেন, 'I am become the destroyer of World'— আমি বিশ্বধ্বংসী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলাম। আধুনিক পরমাণু বোমার জনকের এই মন্তব্যর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে কুরুক্ষেত্রে ব্যবহৃত এবং স্বয়ং ব্যাসদেব বর্ণিত সেই 'বিশ্বধ্বংসী' 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছিল বস্তুত পরমাণু অস্ত্র। তখন তা অন্য কারও জানা থাকুক বা না থাকুক অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়ে অবগত ছিলেন। তা না হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর প্রবল জলস্ফীতি ঘটবে এটা তিনি জানাবেন কীভাবে?

পরমাণু সম্পর্কে প্রাচীন ভারত যে একেবারে অন্ধকারে ছিল এমন ধারণা করার কোনও কারণ নেই। এখন থেকে ২ হাজার ৬০০ বছর আগে ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ঋষি কণাদের যে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্ব (five physiscs theory) আমরা পাই সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই পঞ্চভূতে পরিব্যাপ্ত। কণাদের তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণু হলো 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচরং'— পরমাণু হলো অখণ্ড বা অবিভাজ্য, মণ্ডলাকার বা গোলাকার এবং বিশ্ব চরাচরে সর্বত্র তা পরিব্যাপ্ত। সেই পাঁচ ভৌত হলো ক্ষিতি, অপ,তেজ, মরুৎ ব্যোম। এই যে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তার মধ্যে বিগ ব্যাং (মহাবিস্ফোরণ) থেকে ব্ল্যাকহোল (কৃষ্ণগহ্বর) পর্যন্ত যা কিছু ভাঙাগড়া— সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সবকিছুই সংগঠিত হয় পারস্পর সংযুক্ত পরমাণুর ঘনীভূত ক্রিয়া-বিক্রিয়ায়। কণাদের এই পঞ্চভৌতিক তত্ত্ব এতটাই গুরুত্ব লাভ করে যে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী তথা theory of general relativity-র আবিষ্কারক আলবার্ট আইনস্টাইন পর্যন্ত তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন।

ভারতীয় আর্যত্বে সময়ের হিসাবে কণাদ অনেক নবীন গবেষক। বস্তুত পরমাণু সম্পর্কে বেদের অনুষঙ্গ উপনিষদ থেকেই আমরা একটা তাত্ত্বিক ধারণা পাই। বেদের প্রারম্ভকাল যে মহাভারতের যুগের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে, বিশেষ করে ঋকবেদের, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর নেই বললেই চলে।

ঋষি উদ্দালক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে নিয়ে একদিন একটা বটগাছের নীচে বসে আছেন। এমন সময় একটা বটফল নীচে এসে পড়ল। উদ্দালক পুত্রকে ফলটা কুড়িয়ে এনে ভাঙতে বললেন। শ্বেতকেতু তা করে পিতাকে দেখিয়ে বললেন, ভেতরে সর্ষের দানার মতো ছোট্ট ছোট্ট বীজ রয়েছে। ঋষি তার একটা দানাকে ভাঙতে বললেন। শ্বেতকেতু কোনওরকমে তা করার পর উদ্দালক কণা পরিমাণ সেই বীজটাকে আবারও ভাঙতে বললেন। কিন্তু শ্বেতকেতু অনেক চেষ্টার পরেও তা আর ভাঙতে পারলেন না। এবার ঋষি উদ্দালক ছেলেকে বোঝাতে লাগলেন— এই যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা যাকে তুমি আর

ভাঙতে পারলে না এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে এই বিশাল বটবৃক্ষের শক্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই অংশটা অনুসরণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অণু পরিমাণ বস্তুকণা যাকে আর বিভাজন করা যায় না বা যা অবিভাজ্য, ভৌত বিজ্ঞানে তাকে বলা হয়ে থাকে অণু। গ্রিক ভাষায় 'অ্যাটম।' গ্রিক অভিধানে অ্যাটম মানেই হলো which is indivisible। বিজ্ঞানীরা পরে অবশ্য অ্যাটমকে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদিতে বিভাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অতি উচ্চ প্রযুক্তির আণুবীক্ষণিক এই বস্তুকণার নাম nueclear বা পরমাণু। এর মধ্যে যে মহাশক্তি রয়েছে তাহলো পরমাণু শক্তি বা nueclear Power। এর সৃষ্টিশীল ক্ষমতা যেমন অসীম তেমনি ধ্বংস ক্ষমতাও মারাত্মক। পরমাণু থেকে যে radioactive radiation বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে তার তীব্রতা এককথায় অকল্পনীয়। আপাত দৃষ্টিতে এর আবিষ্কার অনেক আধুনিক মনে করা হলেও বৈদিক ঋষিরা যে এর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের এই রূপক কাহিনির মাধ্যমে তার একটা তাত্ত্বিক ধারণা আমরা লাভ করতে পারি। এখন বিজ্ঞান গবেষকদের কেউ কেউ রীতিমতো জোরের সঙ্গেই বলছেন যে অনেক বছর আগেই এই মহাশক্তির ফলিত রূপ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে। এই সূত্রে পণ্ডিতদের একাংশের মতে পরমাণুর মহাবিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই কারণে মানবতা, মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্যই মর্ত্যধামে অবতাররূপী দয়াময় ওই মহাযুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

বিষয়টা নিঃসন্দেহে বিতর্কিত এবং আরও গভীর গবেষণার দাবি রাখে। কিন্তু এক কথায় নস্যাৎ করে দেওয়ার মতোও নয়। যাঁরা কুরুক্ষেত্রে পরমাণু যুদ্ধ হয়েছিল বলে দাবি করছেন তাঁরা কিন্তু সবাই বিজ্ঞান গবেষক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একজন পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিস টেলর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন। রাজস্থানে যোধপুরের পশ্চিমে থর মরুভূমি সংলগ্ন এলাকায় এক জায়গায় পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা এত তীব্র যে সেখানকার লোকেরা দীর্ঘকাল ধরে অস্বাভাবিক মাত্রায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বিশেষ করে ফুসফুসে। এই বিকিরণ অনেক হাজার বছর ধরে হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মাতৃগর্ভেই অনেক ভ্রূণ অপাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। বছর কয়েক আগে সরকার থেকে এলাকাটা পৃথক করে রাখা হয়েছে। এ তথ্য টেলরের জ্ঞাতসারে এসেছে সেখানে মাটির তলায় পুরাখনন চালাতে গিয়ে। যেখানে একটা অতি প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। দাবি করেছেন এক সময় সেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন যা প্রকৃতপক্ষে হিরোশিমার ধ্বংসের সমান। তবে তার সময়কাল নিয়ে তিনি কোনও মত বা তথ্য প্রকাশ করেননি। কিছু প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতার কারণে জায়গাটার নামও নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করতে পারেননি। এই সূত্রে আন্দাজ করা যেতে পারে জায়গাটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিব্যাপ্ত এলাকার একাংশ হতে পারে। টেলরের প্রকাশ করা এই তথ্যকে এখন পর্যন্ত কেউ খণ্ডন বা নস্যাৎ করেননি। অতঃপর, আন্দাজটা যদি বাস্তব হয় তাহলে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মহাভারতে সত্যি সত্যিই পরমাণু যুদ্ধ হয়েছিল এবং তার ধ্বংস সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল বলেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্ববিদিত বীর্যবান চরিত্রের বাইরে গিয়ে কেবলমাত্র মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর তাগিদেই পাণ্ডবদের জন্য অর্ধেক রাজত্বের দাবি থেকে মাত্র পাঁচখানা গ্রামে নেমে এসেছিলেন। তবে তাঁর ওই ভূমিকার এটাই প্রকৃত কারণ ছিল কিনা মহাভারত তথা শ্রীকৃষ্ণ গবেষকদের তা নিয়ে আরও অনেক গভীর অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করা দরকার। তাতে কৃষ্ণ চরিত্রের মহিমার দিকটা যেমন আরও বেশি আলোকিত হবে তেমনি প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার একটা আলোকস্তম্ভের দরজাও হয়তো খুলে যাবে। ◻

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

সেবিকা, বান্ধবী, মাতা নিবেদিতা

স্বস্তিকা পত্রিকায় ২৫ জুলাই পরম্পরা বিভাগে লেখক নিমাই কুমার মুখার্জির লেখা পড়ে খুব ভালো লাগল। 'নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতের প্রতীক হোক বজ্র' লেখাটি খুব যুগোপযোগী। বিদেশিনী এক নারী যিনি তখনকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞাত, সেই বিদেশিনী নারী ভগিনী নিবেদিতা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং স্বামী বিবেকানন্দের কাছে শিষ্যত্ব ও স্বামীজীর মন্ত্র ও চিন্তাভাবনায় দীক্ষিত হয়ে ভারতবর্ষের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁকে শিখিয়েছিলেন কেমনভাবে ভারতবর্ষকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

স্বামীজী নিজ হাতে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে নিবেদিতার মাধ্যমে সচেতন করেছিলেন। মার্গারেট সমস্ত অসুবিধা, বাধা, কষ্টের কথা জেনেও ভারতবর্ষকে ভালোবেসে স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবা মন্ত্রকে জপের মধ্যে নিয়েছিলেন। মার্গারেট নিবেদিতার জীবন পণ করেছিলেন ভারতবর্ষের কুসংস্কারে আবদ্ধ মানুষজনকে জ্ঞানের আলো জ্বেলে তাঁদের মুক্ত করতে। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে নারী শিক্ষা বিস্তারে যাবতীয় কুপ্রথার বিরুদ্ধে নারীসমাজকে লড়াই করতে শিখিয়েছিলেন এই আইরিশ মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রসমান কঠিন মন ও বজ্রের মতো কঠিন দুই বাহুর শক্তিতে প্রাণিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষের সেবাকাজে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে ভালবেসে আর স্বামীজীর আদর্শকে সামনে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

এদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরাতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর চরিত্রকে অন্য ধাতুতে গড়েছিলেন। লোকমাতা নিবেদিতা, সারদা মায়ের 'খুকি' স্বামীজীর ভগিনী হয়ে উঠেছিলেন ভারতের আকাশের প্রোজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

—সঞ্জয় ব্যানার্জি,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলি।

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ভারতবাসীরা

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আমরা ভারতবাসীরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আমাদের পূর্বসূরীদের মহান আত্মদান স্মরণ করব না কি স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে ইসলামি রাষ্ট্র বানানোর যে ছক কষছে- তাদের সঙ্গে আনন্দ উদ্‌যাপন করব? ২০৪৭ সালে ইসলামিক ভারত গড়ার যে ভিশন ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে বিহারের ফুলওয়ারি শরিফে গ্রেপ্তার হওয়া দুই জঙ্গির কাছে, সেইসব নথিতে উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া গেছে। সে বিষয়ে ভারতবাসী হিসেবে আমার মতো নাগরিকরা যথেষ্ট শঙ্কিত।

কট্টরপন্থী মুসলিম সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া তাদের প্রশিক্ষিত সদস্যদের দিয়ে তুরস্কের মতো ইসলামিক দেশগুলির সাহায্যে ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে। নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি-র প্রাক্তন সদস্য জঙ্গি আতাহার পারভেজ ও প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক মহম্মদ জালালউদ্দিন এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকার তহবিল সংগ্রহ করেছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। পিএফআই-এর ভিশন ডকুমেন্টে বলা হয়েছে, " আমরা ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ফিরেয়ে দেব। যা ব্রিটিশরা কেড়ে নিয়েছিল। সর্বত্র পিএফআই-এর ব্যানারের ছত্রতলে মুসলমানদের একত্র হওয়া দরকার। পার্টিসহ আমাদের সমস্ত শাখা সংগঠনের নূতন সদস্য সংগ্রহ এবং নিয়োগের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। একই সঙ্গে ভারতীয় হওয়ার ধারণার বাইরে সবার মধ্যে একটি ইসলামিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করা হবে, সেখানে তাদের আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক কৌশল, তলোয়ার, আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। কিছু ব্যক্তি যারা নিজেদের আন্তর্জাতিকবাদী ও এবং নাস্তিকতার অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়— তাদের থেকেও মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য ভারতের মধ্যে অনুরূপ সংগঠন তৈরিতে আমাদের আগুয়ান হওয়া উচিত। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাটা এখনও দেখা যাচ্ছে মজবুত যে ব্রিটিশরা হিন্দুস্তানিদের থেকে নয়, আমাদের হাত থেকেই শাসনভার নিয়েছিল।

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

সমস্যাটা চিহ্নিত করা সহজ, কারণটাও বলা দরকার

অনেক অর্থনীতিবিদ বলেছেন আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা হলো বেকারি। সংবাদপত্রে তা ফলাও করে ছাপা হয়। দেশের বিরোধী দলগুলিও এতে ভীষণ খুশি। মনে করে হাতে গরম ইস্যু পাওয়া গেছে। এই ইস্যু তাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবে। তাই আসল সত্য যাতে সামনে না আসে তারই চেষ্টা করে তারা করে। কেন আমাদের বেকার সমস্যা, সেদিকে ইতিপূর্বে ঠিক মতো নজর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি আমাদের দেশের বড়ো বড়ো নেতারা। তারা মানুযের দৃষ্টি সর্বদাই কায়দা করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল। তা হলো পুকুরচুরি। আর হলো জন বিস্ফোরণ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন দেশ গড়ার কথা ছিল, তখন সেদিনের রাষ্ট্রনায়করা সেসব না ভেবে নিজেদের পকেটের শ্রীবৃদ্ধি করতে ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জাপানকে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সেই জন্য জাপান সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে হত মিত্রশক্তিকে। চিন্তা করুন সেদিনের দেশপ্রেমিক জাপানি মানুষজন শুধু বুকে দেশপ্রেমের আগুন জ্বেলে নতুন জাপান গঠনে প্রাণপাত করেছিল। তারা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকাও শোধ করেছিল। আজ সেই জাপান বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশকে চমকে দিয়ে বিভিন্ন দিকে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে। আর আমরা? সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দরজায় দরজায়

ফঃ ৩

ঘুরে বেড়িয়েছি।

আজ যখন আমাদের দেশ বেশ কিছু দেশকে গম দিতে পারছে, কই সে ব্যাপারে তো কোন পত্র-পত্রিকায় হেডলাইনে খবর এলো না? পূর্বতন সরকার কী পরিমাণ চুরি করতো, কাটমানি খেতো, তার একটা ছোট উদাহরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন। আজ যে নব পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক চলছে সেই যখন প্রকল্প শুরু হয়েছি মনমোহন সিংহ আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সালটা ২০১২। তখন সরকার ৩৫০০০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের খরচ বাবদ ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। আজ ওরা যদি ওই কাজটা করতো তাহলে খরচ বেড়ে দাঁড়াতো ৩৯০০ কোটি টাকা।

আজ মোদীজীর নেতৃত্বে দেশ চলছে। এখানে কাটমানি নেওয়া বা খাওয়ার ব্যবস্থা আর নেই। তাই ২০২০ সালে নতুন পার্লামেন্ট ভবনের ৬৫০০০ বর্গমিটার আয়তনের খরচ ধার্য করা হয়েছে ৯৭০ কোটি টাকা। এটা দেখে পরিস্কার বোঝা যায় কী পরিমাণ টাকা পুকুর চুরি হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই। কে করবে শিল্প? কে করবে চাকুরির ব্যবস্থা? বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো দেশ আজ জন বিস্ফোরণের সম্মুখীন। চীন অনেক আগেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন করেছে। কই, চীনে তো কোনও বাধা আসেনি। তাহলে ভারতে কেন বাধা আসবে?কারা বাধা দিচ্ছে? কেন দিচ্ছে? তা আজকের যুবসমাজকে উপলব্ধি করতে হবে। পত্র-পত্রিকাগুলি কেন তা আড়াল করছে তাও চিন্তা করতে হবে বইকী।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে আবার কেন ভিক্টোরিয়ার নামে মেট্রো স্টেশন?

অবশেষে এসপ্লানেড মেট্রোরেলের জট কাটলো। ভিক্টোরিয়া গেটের সামনে ২৮০ মিটার দূরে মেট্রোর স্টেশনের নাম হবে ভিক্টোরিয়া। শুনে খুব তাজ্জব লাগে। এ প্রসঙ্গে বলি ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যিনি ‘বার্ড অব ইংল্যান্ড’ নামে সারা বিশ্বে খ্যাত, তাঁর জন্মস্থান স্ট্যাটফোর্ড অন আভনে তাঁর মূর্তি স্থাপন করা আছে। তাঁর সামনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিও স্থাপিত হয়েছে। স্ট্যাচুতে দেখা যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দুই মহাকবি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। এ হলো সাংস্কৃতিক মিলনের প্রতীক। কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে রানি ভিক্টোরিয়ার নামে স্টেশন কীসের প্রতীক হবে? নিশ্চয় অত্যাচারী ইংরেজদের শোষণের প্রতীক হবে। ১৯০১ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কলকাতায় মহারানির এই সৌধ নির্মাণ করান।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধটাই ভারতে ঔপনিবেশিকতা ও শোষণের প্রতীক। ভারতীয়দের শোষণ করা টাকায় ইংরেজরা তৈরি করেছে রানির ওই সুদৃশ্য স্মৃতি সৌধ। আমরা জানি ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইংরেজরা নির্মমভাবে তা দমন করে। আন্দোলনের পর ইংরেজদের গদি টলমল হলে ইংল্যান্ডের রানি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয়দের কাছে ঔপনিবেশিকতার প্রতীক ছাড়া আর কিছুই না।

তাই মহাবিদ্রোহের স্মরণে ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এই নতুন মেট্রো স্টেশনের নাম হওয়া দরকার রানি লক্ষ্মীবাঈ মেট্রো স্টেশন। আমাদের দেশের রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্ব, দেশপ্রেম শুধু কী ইতিহাসের পাতায় থাকবে? কেন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব না? কেন আবার সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার নাম থাকবে? মনে হয়, আমরা ইংরেজদের থেকে মুক্তি পেয়েছি ঠিক কথা, কিন্তু মুক্ত হতে পারিনি তাদের কালচারাল উপনিবেশ থেকে। আর কতকাল আমরা এভাবে মনে মনে দাস হয়ে থাকব?

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

সবে কানে টান পড়েছে

কোনও নির্বাচন নেই, নেই ভোটের প্রস্তুতিও। অথচ বীরভূম থেকে বাঁকুড়া মায় কলকাতাতেও দেদার বিলোনো হচ্ছে গুড়, বাতাসা, নকুলদানা। সঙ্গে বাজছে চড়াম চড়াম বাদ্যি। অসময়ের এই উৎসব আসলে উলটপুরাণের প্রকাশ। এতদিন বীরভূমের যে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল মানুষের মনে সন্ত্রাস তৈরির জন্য গুড় বাতাসা খাওয়াবার নিদান দিতেন, তিনি এখন সিবিআইয়ের হেফাজতে।

গোরু পাচার কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হওয়া অনুব্রত প্রকাশ্য সভামঞ্চে পুলিশের কবজি কেটে নেওয়ার কথা বলেছিল। তারপরেও সে বুক ফুলিয়ে রাজনীতির ময়দানে ভয় দেখানোর ব্যবসা চালিয়ে গেছে। কারণ তার দলের সুপ্রিমোর হাত ছিল তার মাথায়। একজন গড়পড়তা কর্মী। দলীয় নেত্রীর মতে তার মাথায় অক্সিজেন নাকি বরাবরই কম। পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। মুদিখানার কর্মী হিসেবে কর্মজীবন শুরু। তারপর বাজারে মাগুর মাছ বেচত যে অনুব্রত, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সে-ই হাজার কোটি টাকার মালিক। এমন কোনও বেআইনি কাজ নেই যেখানে অনুব্রত হাত পাকায়নি। নীচুতলার কর্মীরা বলছে, অনুব্রত তোলাবাজি ও পাচারের টাকা পৌঁছে দিত উপরতলায়। তাদের প্রশ্রয়েই এমন দাঁত-নখ বের করে হুংকার ছাড়তো মোটা মাথার অনুব্রত। আজ যখন সে সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়েছে , তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে চাইছে তৃণমূল। ওদিকে পার্থ চ্যাটার্জি, এদিকে অনুব্রত। সবে দুই রাঘব বোয়াল ধরা পড়েছে। তালিকা অনেক দীর্ঘ। সত্যিই আইনের হাত লম্বা। এখন তো সবে কান দুটোতে টান পড়েছে। টান বেশি হলে এক এক ধাপ ওপরে উঠে মাথাটাও চলে আসবে অচিরেই। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা!

—**কবীর হেমব্রম,**
পাড়া, পুরুলিয়া।

পায়ে পায়ে পঁচাত্তরে

বিজয় আঢ্য

১৯৭৮-এ শীতের এক দুপুর। স্বস্তিকার দোতলার ঘরে এখন যেটা সম্পাদকীয় দপ্তর সেখানে ঢুকে দেখি পুব দিকে মুখ করে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ভবেন্দুদা (স্বস্তিকার প্রাক্তন সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্য) একটা বড়ো টেবিলের উপর কিছু লিখছেন। সিলিং থেকে আসা একটা লম্বা তারে বাঁধা বেশি পাওয়ারের বাল্ব টেবিলের উপর ঝুলছে। সারা অফিসে আর কাউকে কোথাও দেখলাম না। আসার প্রয়োজনটা অর্থাৎ গত বন্যার কিছু তথ্য সংগ্রহের কথা জানালে পুরনো স্বস্তিকা রাখার একটা সেলফ দেখিয়ে দিলেন। সেটাই প্রথম স্বস্তিকা দপ্তর দর্শন এবং সম্ভবত ভবেন্দুদাকেও। যদিও কলেজ জীবনের শুরু থেকে স্বস্তিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। বস্তুত তখন কল্পনাতেও ছিল না যে একদিন স্বস্তিকার হালটা কাঁধের উপর চাপবে। বড়োদের যখন বলেছি, সেসময়ের রোজকার কাজের নির্মল আনন্দের কথা, তখন বলা হলো, রুচি নয়, প্রয়োজনে 'সিনিয়র' কাউকে যেতেই হবে। এরপরও 'সিনিয়র'-এর কার্ডটা ফেললেও টিকল না। '৮৫-র শেষাশেষি ব্যাগপত্র নিয়ে ২৭/১বি-তে ঢুকলাম। স্থান হলো নীচের তলার বিদ্যার্থী পরিষদের ঘরের একটা তক্তায়। এখনকার থেকে তখনকার দপ্তরের আকাশ-পাতাল ফারাক। তেতলাটা প্রায় অব্যবহৃত— 'প্রবেশ নিষেধ'। দোতলায় দুটো ঘর— একটাতে সম্পাদকীয়, আর অন্যটিতে ডেসপ্যাচ। দোতলার বারান্দায় 'ব্লক' রাখার একটা সেলফ, আর একমাত্র বাথরুম। খাওয়াদাওয়া পাশের বাড়ি ২৬ নং-এ। ভবেন্দুদার খাবার টিফিন কৌটায় আসতো। বিজ্ঞাপনের জন্য যাই লেখা হোক, সার্কুলেশন তখন তিনহাজারের আশেপাশে। সম্পাদকীয় বিভাগে তখন আড়াই জন। ভবেন্দুদা, হাফ টাইমের দুর্গাদা আর নবনিযুক্ত এই বান্দা। নিয়মিত লেখক তখন দুজন— গূঢ়পুরুষ (স্টেটসম্যানের রণজিৎ রায়) আর অগ্নিশর্মা (যুগান্তর/আজকালের অসীম মিত্র)। তবে সেসময় দুজন বিশিষ্ট সাংবাদিক অনন্ত জানা ও অনিল ভট্টাচার্য (যুগান্তর) বেনামে এবং তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তম ঘোষ (টেলিগ্রাফ),তাপস গঙ্গোপাধ্যায় (আনন্দ), কিশলয় ঠাকুর (আনন্দ), রমেন দাস (জনসেবক) লিখতেন। তখন স্বস্তিকা সংবাদ সাপ্তাহিক। স্বস্তিকার খবরের জেরে তৎকালীন সম্পাদক সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার নয়, দুবার জেলে যেতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হয়েছে। মাথা উঁচু করে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। বস্তুত জন্মলগ্ন থেকেই স্বস্তিকা রাজরোষের শিকার। জরুরি অবস্থার সময়কার কথা না হয় বাদই দিলাম, বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পরও (১০.১২.৯২) স্বস্তিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ভারতের সংবাদপত্র জগতে স্বস্তিকাই বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা যাকে বারবার রাজরোষের কোপে পড়তে হয়েছে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, তালা বন্ধ করেও স্বস্তিকা প্রকাশ বন্ধ করতে পারেনি। বিবেকানন্দ রোডে সুনীল মল্লিকের বাড়ি থেকে স্বস্তিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। স্বস্তিকা কর্মীদের সঙ্গে এসময় সহযোগিতা করেছেন ড. পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়।

তখন মদন মিত্র লেনের বঙ্গশ্রী প্রেস থেকে স্বস্তিকা ছাপা হতো। ন্যাতার মতো ভিজে কাগজে প্রুফ আসত। পাখার হাওয়ায় তা শুকিয়ে নিয়ে প্রুফ দেখা হতো। ছবি মানে ব্লক। এক একবার ছবি এমন ছাপা হয়ে আসত যে কিছুই বোঝা যেত না। নবনির্মিত কেশব ভবনের ছবি ছাপা দেখে একবার একজন তো তা ছুড়ে ফেলেই দিলেন। একথা ভবেন্দুদাকে অবশ্য জানাইনি। যে কঠোর তপস্যা করে তিনি আজীবন স্বস্তিকাকে ধরে রেখেছিলেন...। তাঁর জীবনাবসানের পর স্বস্তিকার সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল--- 'একটা ই-র জন্য।' (১৪।১১।২০০৫)।

নব্বইয়ের শেষের দিকে স্বস্তিকার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী একটু সুপ্রসন্ন হলেন। স্বস্তিকার সুবর্ণ জয়ন্তী(৫০ বছর) এবং ভবেন্দুদার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে সংবর্ধনাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় মহাজাতি সদনে বড়ো বড়ো তিনটি অনুষ্ঠান হলো। স্বস্তিকার লেখক ও এজেন্টদের সম্মেলন হলো। অমলদা, সনৎদা, কালিদা, যুগলজী (জৈথলিয়া), বিষ্ণুজী (বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী) তো ছিলেনই , স্বস্তিকার ব্যবস্থা বিভাগের হাল ধরেছিলেন সুধাময় দত্ত। স্বস্তিকার ষাটবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার মহাজাতি সদনে সঙ্ঘের

স্বস্তিকা দপ্তর সিল করে দেয় তৎকালীন রাজ্যের বাম সরকারের পুলিশ (১৯৯২)

সরসঙ্ঘচালক মাননীয় সুদর্শনজীর উপস্থিতিতে যে কার্যক্রম (০৩.০৯.২০০৭) হয়েছে তা আজ অনেকেরই স্মরণে আছে। পরবর্তীকালে কলকাতার রোটারি ক্লাবে সারাদিনব্যাপী 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থায়ী উন্নতি' বিষয়ে আলোচনা সভাটি প্রশংসার দাবি রাখে। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী, ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়, মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী প্রমুখের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। সেই সময়ে স্বস্তিকার সব সংখ্যা 'ডিজিটালাইট' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং তা কার্যকরও হলো। স্বস্তিকার চলার পথে এটা একটা 'অ্যাচিভমেন্ট'। স্বস্তিকার নিজস্ব 'আর্কাইভ (অভিলেখ্যাগার) গড়ে তোলার সূচনা তখন থেকেই। এই সময়সীমার মধ্যে অফসেটে রঙিন কভার প্রথম (০৮.০৩.২০০৪) ছাপা হলো--- বনবাসীবন্ধুদের নিয়ে। সে কী আনন্দ!

সালটা ১৯৮৮। সঙ্ঘের তৎকালীন ক্ষেত্র প্রচারক মাননীয় সুদর্শনজী দেখা হলেই বলতেন, ডিটিপি করো। তাঁর প্রেরণায় সনৎদা, অভিরাম ও অজিত ভকতের সঙ্গে সল্টলেকে কম্পিউটার প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া হলো। কিছুদিনের মধ্যেই স্বস্তিকায় কম্পিউটার এল। প্রথমে কম্পোজ, পরে মেকআপ এবং শেষে প্রচ্ছদও কম্পিউটারের মাধ্যমে করা শুরু হলো। এসব কাজের জন্য অজিত ভকত ট্রেনিং নিয়ে এল। সঙ্গে সম্রাট পালও ছিল। ছিল সোনালি দাস ও অজিত ব্যানার্জি। ব্যবস্থা বিভাগে তখন ছিল অনিল কুণ্ডু, অভিরাম সরকার, সুবল দত্ত, চিত্ত পাত্র, প্রদীপ সাঁতরা, প্রণয় রায়, শুভাশিস দীর্ঘাঙ্গী, শিবু ঘোষ প্রমুখ। আর সম্পাদকীয় বিভাগে গোড়া থেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রদীপ ঘোষ, রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নাময় চৌধুরী। পরে ক্রমে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেশ্বর বড়াল, সোমনাথ নন্দী, অমল চট্টোপাধ্যায় (আনন্দবাজার), নবকুমার ভট্টাচার্য, দীপক গাঙ্গুলী, বাসুদেব পাল, পিনাকপাণি ঘোষ, অর্ণব নাগ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোজিৎ সরকার, দিবাকর রায়, তুষারকান্তি মজুমদার, নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত, ড. প্রণব রায়, ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায়, তথাগত রায়, সব্যসাচী বাগচী, স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, অমলেশ মিশ্র, এন সি দে, কুটমল ভট্ট, হরিপদ কেরানী, পত্রনবীশ প্রমুখ। এই সময় দুজন ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতেন— একজন দীনেশ সিংহ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার, শিবাজী গুপ্ত ছদ্মনাম) এবং দ্বিতীয় জন সুধাংশু পালিত (ছদ্মনাম নিশাকর সোম। এক সিপিএম নেতার ডানহাত বলে পরিচিত)। শিবাজী গুপ্তের কলম স্বস্তিকার শেষ পৃষ্ঠার প্রকাশিত হতো এবং তা এতই জনপ্রিয় ছিল যে অনেক পাঠক শেষ পৃষ্ঠা থেকে স্বস্তিকা পড়তে শুরু করতেন। এছাড়া গল্প উপন্যাস ইত্যাদি নিয়ে যাঁরা স্বস্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন রমানাথ রায়, এষা দে, শেখর বসু, কণা বসুমিশ্র, জহর সরকার, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, সুমিত্রা ঘোষ, জিষ্ণু বসু, প্রসিত রায়চৌধুরী, গোপাল রায়, প্রবাল চক্রবর্তী, শেখর সেনগুপ্ত, গোপাল চক্রবর্তী, নবকুমার বসু, ড. সীতানাথ গোস্বামী, প্রদীপ ঘোষ। এছাড়াও অনেকে রয়েছেন যাঁদের নাম এখন মনে পড়ছে না।

স্বস্তিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা ছিল সঙ্ঘের বঙ্গপ্রান্তের ও অখিল ভারতীয় অধিকারীদের। অমল বসু, কালিদাস বসু, বসন্তরাও ভট্ট, কেশবরাও দীক্ষিত, সুজিত ধর, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগলকিশোর জৈথলিয়া প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আরও একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন প্রবাসী বাঙ্গালি নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য। তিনি স্বস্তিকার অভিভাবকের মতো এখনও পাশে আছেন।

স্বস্তিকা ক্রমে লেটার প্রেস থেকে অফসেট প্রেসে স্থানান্তরিত হয়েছে। ট্যাবলয়েড সাইজ থেকে ম্যাগাজিন সাইজে (১৮.০৪.২০১১, নববর্ষ সংখ্যা,) রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি সংখ্যায় রঙিন প্রচ্ছদ। ভেতরের কয়েকটি পৃষ্ঠাও রঙিন। স্বস্তিকাকে শুধু সংবাদ সাময়িকীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি পারিবারিক সাময়িক পত্রিকায় রূপান্তরের চেষ্টা হয়েছে। তবে হিন্দু জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা তথা জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে সোচ্চার হওয়া অর্থাৎ যে আদর্শের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল তা শুধু অটুট নয়, গত চুয়াত্তর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা করে চলেছে। এই সংখ্যা থেকেই স্বস্তিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ হতে শুরু করে।

দেশ ভাগ, উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন, চীন ও পাকিস্তানের আক্রমণ, কংগ্রেসের আপোশ নীতি, কমিউনিস্টদের দ্বিচারিতা, ইসলামি উগ্রবাদীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ, তিনবিঘা ও ছিটমহল সমস্যা, সেকুলারবাদীদের হিন্দু বিরোধী ব্যাখ্যা, ভারতের ইতিহাস বিকৃতি ও শ্রদ্ধাবিন্দুগুলিকে নিয়ে অপমান, কাশ্মীর, পঞ্জাব ও অসমে বিচ্ছিন্নবাদীদের ষড়যন্ত্র, অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরণ, জনসংখ্যার ভারসাম্য বিপর্যয়ের ষড়যন্ত্র, সংরক্ষণ, জরুরি অবস্থা ও শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের অবিবেচনাপ্রসূত কাজকর্ম ও দুর্নীতি, সিএএ এবং এনআরসি-র পক্ষে সোচ্চার, সেইসঙ্গে ভারতীয় মনীষীদের জীবন ও তাঁদের অবদান, ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে তুলে ধরার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা করে চলেছে। এককথায় স্বস্তিকা হিন্দু জাতীয়তার কণ্ঠস্বর।

স্বস্তিকা পায়ে পায়ে পঁচাত্তরে পৌঁছল। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ লেখকরা স্বস্তিকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। স্বস্তিকার ডিজিটাল সংস্করণও আসন্ন। নবীন পরিচালকদের পরিচালনায় স্বস্তিকার প্রচার-প্রসার ইতিমধ্যেই দেশের বঙ্গভাষী এলাকায়, যেমন ত্রিপুরা, দক্ষিণ অসম, আন্দামান ইত্যাদি স্থানে পৌঁছেছে। আর্থিক কাঠামোও ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। সমৃদ্ধ, সক্ষম ও বিশ্বে মার্গদর্শনকারী হিসেবে ভারতের পুত্ররূপ হিন্দুজাতিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাঠবেড়ালির মতো কাজ করার যে সুযোগ লাভ করেছে, স্বস্তিকা এজন্য নিজেদের ধন্য মনে করে।

(লেখক স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক)

সূর্যমুখী স্বস্তিকার অনির্বাণ শিখা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সে এক ছিন্নমস্তা কাল। সেই কাল পরিক্রমার এক মাহেন্দ্রক্ষণে ভারত ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর সূচনা। দেশে তখন ইংরেজের উপনিবেশিক শাসন যথেষ্ট প্রোথিত। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চালে প্রাচীন দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে পরিকল্পিত ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। লক্ষ্য, জাতির সংহতি-সাধনা ও চিরাচরিত অথচ পরীক্ষিত ঐতিহ্যের শিকড় ছিন্ন করা। সেই সঙ্গে স্বাদেশিকতার বোধ থেকে আলোক অপসারণ করে চির অমাবস্যার তমসা সুবিস্তৃত করা। একটি জাতিকে নিরাবলম্ব অর্কিডে পরিণত করা।

তবুও জাতীয়-মহীরুহ উৎপাটন করা গেল না। সেই আবহেও নতুন পল্লব সৃষ্টি হতে থাকে। উনবিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্বে গঠিত হলো ভারতীয় কংগ্রেস--- কিছুটা সরকারি মদতেই। ফলে সর্বভারতীয় সংগঠন হয়েও তা জনবিচ্ছিন্ন। শুধুই আবেদন- নিবেদনের মহাসঙ্ঘ।

তবে বেশিদিন নয়। বিশ শতকের সূচনাতেই কংগ্রেসে বইতে থাকে নরম ও চরমপন্থীদের কৃষ্ণা-গোদাবরী। তারই মধ্যে ইংরেজ সরকারের বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা। এতে মরা গাঙে যেন বান এল। বঙ্গদেশে সুসংগঠিত হতে থাকে বিপ্লবী আন্দোলন। গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসেন সক্রিয় রাজনীতিতে সেভাবে না থেকেও রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগামীরা।

বিদেশি শাসক ভীত। বিভাজন নীতিকে আরও জোরদার করতে আবার একই খেলা। ১৯০৬-এ গঠিত হলো মুসলিম লিগ। ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া হয় সেকথা তখন শাসক বিস্মৃত হয়েছেন। ফলে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি পৃথক সংগঠন হিসেবে ১৯১৫-তে মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায় প্রমুখ গড়ে তুললেন হিন্দু মহাসভা। কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্ব এবং শাসক ব্রিটিশকে চাপে রাখতেই এর জন্ম 'প্রেসার গ্রুপ' হিসেবে। তখন অবশ্য সংস্থার নাম ছিল 'সর্বদেশক হিন্দুসভা'। হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় তার জন্ম। ছ' বছর বাদে ১৯২১-এ রাজনৈতিক দল হিসেবেই আত্মপ্রকাশ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা হিসেবে। প্রসঙ্গত, ১৯০৯-এ মর্লে মিন্টো সংস্কার নীতিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গড়ে তোলার প্রতিবাদে ওই বছরই লাল চাঁদ এবং ইউএন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পঞ্জাবে গঠিত হয়েছিল পঞ্জাব হিন্দু সভা। সনাতন ভারতের শাশ্বত ধ্যানধারণা ও ঐতিহ্য রক্ষায় পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভার সেটিই ছিল বীজ।

হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগেই মহারাষ্ট্রের ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার (১৮৮৯-১৯৪০) সর্বদেশক হিন্দুসভা থেকে পদত্যাগ করে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজ সংগঠন করে দেশভক্ত মানুষ তৈরি করা। স্বামী বিবেকানন্দের মতোই ডাঃ হেডগেওয়ার বলতেন, শুধু বক্তৃতায় দেশ স্বাধীন হবে না, তার জন্য মানুষ তৈরি করতে হবে। আর তারই জন্য তিনি জীবনপাত করেন শৃঙ্খলাবদ্ধ, দেশভক্ত এবং ঐতিহ্য অনুগত স্বয়ংসেবক তৈরিতে।

ডাঃ হেডগেওয়ারের পর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক হন মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (১৯০৬-১৯৭৩)। সংক্ষেপে এমএস গোলওয়ালকর। তবে গুরুজী নামেই তিনি

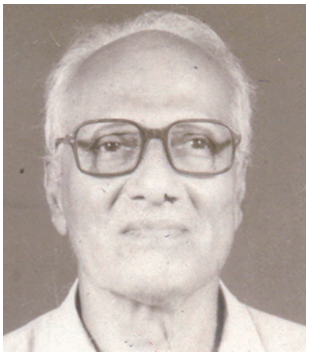

ভৈরব ভট্টাচার্য

অনিল ভট্টাচার্য

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসীম কুমার মিত্র

বেশি পরিচিত। গান্ধীজী নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা আন্দোলনের থেকে তিনি জোর দেন দেশ ও সংস্কৃতি রক্ষায়।

বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সূচনা ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ওই বছর ২২ মার্চ ভারতীয় নববর্ষের দিনে কলকাতার মানিকতলায় তেলকল মাঠে সঙ্ঘের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন গুরুজী গোলওয়ালকর এবং বিঠ্ঠল রাও পাতকি। শাখার মুখ্যশিক্ষক হন জয়দেব ঘোষ (১৯২৩-২০১৩)। বয়স তখন তাঁর মাত্র ষোলো। সে সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন কালিদাস বসু (১৯২৪-২০১০)।

কলকাতা তথা বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ইতিহাস তিনটি পর্বে বিভক্ত। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৩, ১৯৫৩ থেকে ২০০৮ এবং ২০০৮ থেকে বর্তমান সময়। সে সময় বঙ্গদেশে সংগঠন গড়ে তোলা এবং কার্য-পরিচালনার জন্য আসেন প্রথমে বালাসাহেব ওরফে মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস। ১৯৪৫ থেকে এ দায়িত্ব নেন দত্তোপন্ত ঠেংড়ী এবং ১৯৪৯-এ যে দায়িত্ব বর্তায় একনাথ রানাডের ওপর।

এই তিনজনের নেতৃত্বেই কলকাতা-সহ প্রায় সারা বঙ্গদেশে গড়ে উঠতে থাকে সঙ্ঘের নানা শাখা। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ যুবকরা যুক্ত হতে থাকেন এই সংস্থার সঙ্গে। প্রসঙ্গত, এঁদেরই একজন হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ কেশব চক্রবর্তী (১৯১১- ১৯৭৯)। তিনি বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। ছাত্র গড়ার অন্যতম কারিগর কেশব চক্রবর্তী ছিলেন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক। আর সেই অপরাধেই গান্ধী হত্যার পর এবং জরুরি অবস্থার সময়ও সরকারের কোপানলে পড়ে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

এসব কথা বাদ দিয়ে এবার বরং ইংরেজ শাসনের শেষ দশকটির কথা একবার স্মরণ করা যাক। বিশ

স্বস্তিকার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত (বাঁ দিক থেকে ভবেন্দু ভট্টাচার্য, সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, সীতানাথ গোস্বামী, দীপঙ্করবাবু ও বিজয় আঢ্য।

শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই কংগ্রেস আর সমস্ত রাজনৈতিক দলের মঞ্চ হয়ে থাকল না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, স্বরাজ দল, ফরোয়ার্ড ব্লক, সমাজবাদী দলগুলি একে একে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের কথা প্রচার করতে থাকে। মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভাও যথেষ্ট জোরালো ভাবেই নিজেদের উপস্থিতির কথা জানাতে থাকে। আর এরই মধ্যে রাজনৈতিক দল না হয়েও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতীয় জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

এই রকম একটা অবস্থায় ভারতীয় সাংবাদিকতাও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সারা দেশেই প্রচার ও প্রভাব বাড়াতে থাকে। রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংস্থাও নিজেদের মত ও পথের কথা জানাতে মুখপত্র হিসেবে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশনায় এগিয়ে আসে।

এর সূচনা অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্রের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই। রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মূলত নিজেদের কথা বলার জন্যই আত্মপ্রকাশ করেছিল উনবিংশ শতকেই। বিশ শতকে বিপ্লবী দলগুলির কথা প্রচারের জন্য 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্' ইত্যাদি পত্রিকার প্রকাশ হতে শুরু করে। স্বরাজ্যদল গঠনের পর দলের মুখপত্র হিসেবে 'ফরোয়ার্ড', 'বাঙ্গলার কথা', 'লিবার্টি' ইত্যাদি পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টি সমেত বামপন্থী দলগুলিরও নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। চারের দশকে প্রকাশিত

ভবেন্দু ভট্টাচার্য

বিজয় আঢ্য

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

তিলক রঞ্জন বেরা

হয় সিপিআই-এর মুখপত্র 'স্বাধীনতা' (১৯৪৫), তার আগে জনযুদ্ধ (১৯৪২), সমাজবাদীদের 'লোকসেবক' (১৯৪৮), শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দুস্থান' ইত্যাদি। ওইরকম একটা অবস্থায় হিন্দু জাতীয়তাবাদীরাও হিন্দু ধর্ম সংরক্ষণে একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবতে থাকেন।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর ছ' মাসও কাটল না। ১৯৪৮-এর জানুয়ারি দিল্লিতে প্রার্থনা সভায় নিহত হলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ ফেব্রুয়ারি নিষিদ্ধ করা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা দেশ থেকে গ্রেপ্তার হয় তিন হাজারের বেশি স্বয়ংসেবক। মে মাস থেকেই মুক্তি পেতে থাকেন ধৃতরা। পশ্চিমবঙ্গেও ঘটল একই ঘটনা।

এই রাজ্যে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে কালিদাস বসু, নারায়ণ মল্লিক, সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বেশ কয়েকজন স্বয়ংসেবক কার্যকর্তা এবং সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী কিছু উৎসাহী মানুষ জুন মাসেই একটি বৈঠকে মিলিত হলেন। বৈঠকে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ এবং ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচল থাকার নীতিতে বিশ্বাসী একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বৈঠকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী ও রামপ্রসাদ দাস। নানা বিতর্ক, মতামত বিনিময়ের পর ওই বৈঠকে সকলেই পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনের কথা মেনে নেন। তারই ভিত্তিতে নেওয়া হয় কয়েকটি সিদ্ধান্ত।

- সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।
- পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে ৫-এ সুকিয়া স্ট্রিট থেকে।
- পত্রিকার স্বরূপ বা আদর্শ হবে জাতীয়তাবোধ। ভারতীয় সনাতন ধর্ম, বিশ্বাস ও নীতিতে নিষ্ণাত এই জাতীয়তাবোধ তথাকথিত ন্যাশনালিজমের বঙ্গীয় ভাষ্য নয়।
- পত্রিকার নাম হবে 'স্বস্তিকা'। স্বস্তিকা একটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ কল্যাণ বা মঙ্গল। ভারতীয় সমাজে সমস্ত ধর্মকর্ম ও শুভকাজের প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্ন। যে কোনো দৈব কাজে মঙ্গলঘটে সিঁদুর দিয়ে এই প্রতীকটি আঁকা আবশ্যিক। বেদ-বিভাগ অনুযায়ী চিহ্নটি আঁকার ক্ষেত্রে সামান্য রূপভেদ থাকলেও মূল স্বরূপ একই। শুধু ধর্মীয় কাজ নয়, ব্যবসায়ীকুলও তাঁদের হালখাতা বা বছরের নতুন হিসাব খাতারও প্রথমেই সিঁদুর দিয়ে এই চিহ্নটি আঁকেন। সেটাই চলে আসছে আবহমানকাল থেকে।

সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলনে স্বস্তিকার প্রচার প্রসারের দিক নির্দেশ দিচ্ছেন কেশবরাও দীক্ষিত। পাশে চেয়ারে (বাঁ দিক থেকে) মনমোহন রায়, শৈলেন সিংহ ও স্বস্তিকার সম্পাদক সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার সার্বিক উন্নয়ন কোন পথে হতে পারে সে বিষয়ে নিজের মতামত দিচ্ছেন সুধাময় দত্ত।

প্রসঙ্গত, পত্রিকার এই নাম নিয়ে কিছু বিরুদ্ধবাদীর অভিযোগ ছিল, এটি হলো জার্মানির হিটলারের নাৎসি দলের প্রতীক। তাই এক্ষেত্রে কিছু ভুল বার্তা যেতে পারে। এই সমালোচকদের অনেকেই জানতেন না যে, জার্মানিতে সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা তাদের জাতীয় জীবনেরই অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সেই চর্চার সূত্রেই ভারতীয় এই মঙ্গলের প্রতীকটি হিটলার ধার নিয়েছিলেন। নিজের নৃশংস ও জনবিরোধী কাজের মধ্য দিয়ে মঙ্গলচিহ্ন স্বস্তিকা প্রতীককে তিনি আতঙ্কের বস্তুতে পরিণত করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাতে এই ভারতীয় মঙ্গলচিহ্নের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়নি এতটুকু।

যাই হোক, ১৯৪৮-এর জুন মাসের ওই বৈঠকে আরও ঠিক হয়, আসন্ন পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথিতেই আত্মপ্রকাশ করবে এই নতুন সাপ্তাহিক। একদিন অধর্মরূপী কংসের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য মথুরায় কংস-কারাগারে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই তিথিই হবে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও ধর্মানুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্প্রচারিত

স্বস্তিকার ৫০ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য।

একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ। স্বস্তিকা পত্রিকার আবির্ভাব লগ্নের অন্যতম ঋত্বিক এবং বঙ্গদেশের অন্যতম প্রথম স্বয়ংসেবক শিক্ষক কালিদাস বসুর স্মৃতিকথন (স্বস্তিকা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪ এপ্রিল, ২০০৮) থেকে জানা যায় ওইসব তথ্য।

'স্বস্তিকা'র জন্মলগ্নে জন্মাষ্টমীর ভূমিকাটি স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে, তারই একটি অংশে সংযত-দীপ্ত ভাষণে বলা হয়,—

"কত সহস্র বৎসর পূর্বে অজিকার এই দিনে এক প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী নরপতি ন্যায়ধর্মের মূলোচ্ছেদ করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ন্যায় ও ধর্মের যাঁহারা সেবক, সত্যের যাঁহারা অনুরাগী, চিরকালের মতো তাঁহাদের স্থান হইল সেই অত্যাচারীর কারাগারে। তবুও সেইদিন নিপীড়িত মানসের হৃদয়বেদনার মাঝখান হইতে কারাকক্ষের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে শাশ্বত সর্বজয়ী শক্তির আবির্ভাব হইল এক নরদেহধারী শিশুর মধ্যে। পাপের প্রচণ্ডশক্তি তাঁহার সম্মুখে সূর্যালোকে কুহেলিকর মতো মিলাইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত আত্মম্ভরী অহংসর্বস্ব মানবজাতির শাশ্বত শিক্ষাস্থল। জন্মাষ্টমীর ঘন-অন্ধকারের মধ্যে উৎসবের বার্তা আসিয়াছে। শ্রাবণের বর্ষণমুখর রজনী শরতের নির্মল প্রভাতের মধ্যে আবার বিলীন হইবে। অধর্মের চিতাভস্মের উপর মানুষ আবার ধর্মরাজ্যের সৌধ গড়িয়া তুলিবে। অমঙ্গলের অবসানে বিশ্বের অঙ্গনে পুনরায় মঙ্গলঘটের প্রতিষ্ঠা হইবে।"

এই সম্পাদকীয়ের মধ্য দিয়েই 'স্বস্তিকা'র তৎকালীন সম্পাদক এবং পরিচালকদের দৃঢ় মানসিকতা, সনাতন আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বাসের প্রত্যয়ের আভাস পাওয়া যায়।

'স্বস্তিকা' প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার এক বছর আগে দিল্লি থেকে ইংরেজি 'আর্গানাইজার' (১৯৪৭), লখনউ থেকে হিন্দি 'পাঞ্চজন্য' (১৯৪৮) প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য জায়গা থেকে এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ তখন সক্রিয়। তারই মধ্যে প্রকাশিত হলো বাংলা সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'। এই পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার সঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকলেও এটি কোনো সময়ই সঙ্ঘের মুখপত্র বলে দাবি করা হয়নি। তবুও বিভিন্ন সময়েই সঙ্ঘনিষ্ঠ বলে এই পত্রিকাকে রাজনৈতিক রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু আদর্শে অবিচল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মতোই 'স্বস্তিকা'র পরিচালকরা সব বাধার পাঁচিল ডিঙিয়ে নিজেদের 'শুভ কর্মপথে' এগিয়ে চলেছে রীতিমতো বীরদর্পেই।

ফেরা যাক আগের কথায়। পত্রিকার নাম, তার আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই পত্রিকা পরিচালনার প্রশ্নটি উঠল। সঙ্ঘের কার্যনির্বাহী ও সক্রিয় স্বয়ংসেবকরা তখন সঙ্ঘের সংগঠন ও কর্মধারার প্রসার ঘটানোর কাজেই ব্যস্ত। তাই পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো বয়সে নবীন অথচ লেখালেখি এবং সাংবাদিকতা সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কিন্তু তরুণের ওপর। সেই সূত্রেই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হলেন হেমেন্দ্রনাথ পণ্ডিত। ভালো লিখতে পারেন, আবার সঙ্ঘের আদর্শ এবং ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতি মনস্ক হেমেন্দ্রনাথকে সাহায্য করার কাজে এগিয়ে এলেন ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো আরও কিছু যুবক। অন্যদিকে পত্রিকার প্রচার এবং প্রসারের দায়িত্বটা ভাগ করে নিলেন স্বয়ংসেবকরাই।

তরুণ বয়সে আদর্শবোধ, একটা কিছু করার উন্মাদনা যতটা তীব্র থাকে সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ঠিক ততটা থাকে না। সংসারের জোয়াল কাঁধে চেপে বসলেই বুকের খাঁচায় ছটফট করা 'তোতাপাখি'র পায়ে শিকল বাঁধতে হয়। বন্দি হয় তোতা। হেমেন্দ্রনাথেরও হলো তাই। একদিকে পারিবারিক প্রয়োজন অন্যদিকে পত্রিকা পরিচালনা নিয়ে কিছু মতান্তরের কারণে পত্রিকার সম্পাদক পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। পত্রিকা প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই হলো সম্পাদক বদল। 'স্বস্তিকা'র দ্বিতীয় সম্পাদক হলেন ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯২৭-২০০৩)।

ভৈরব চন্দ্রের আদি বাড়ি ফরিদপুরের আমতলি, পালং-এ। তাঁর বাবা আশুতোষ কাব্যতীর্থ জীবিকার টানে দিনাজপুরে এসে সেখানকার রাজপুরোহিত এবং স্থানীয় গিরিজানাথ হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত হন। পারিবারিক ঐতিহ্য এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অনুরাগী ভৈরবচন্দ্র জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। সতেরো বছর বয়স থেকেই তিনি যুক্ত হন হিন্দু মহাসভার সঙ্গে। ১৯৪৬-এ তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলকাতায় এসে হিন্দু মহাসভার ছাত্র সংগঠনের কাজে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সংস্পর্শে এসে তাঁরই সঙ্ঘের কাজে যুক্ত হন।

কলকাতায় এসে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ভারত' পত্রিকায় শিক্ষানবিশ প্রুফ সংশোধনের কাজ নেন, কিন্তু সেখানে স্থায়ী চাকরি হয় না। পত্রিকাও উঠে যায়। এরপর তিনি শ্যামাপ্রসাদের 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় পরবর্তীকালে কার্যকরী সম্পাদকের পদে যোগ দেন।

স্বয়ংসেবক হিসেবে ভৈরব ভট্টাচার্য প্রুফ সংশোধন এবং 'স্বস্তিকা' প্রকাশের প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাই কিছুটা স্বাভাবিক পছন্দেই তিনি হলেন পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে তিনিও সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেন। যোগ দেন সরকারি চাকরিতে।

সম্পাদকের দায়িত্ব ছাড়লেও পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলো না তাঁর। ‘কুটমল ভট্ট’ ছদ্মনামে তিনি নিয়মিত লিখতেন পত্রিকায়।

প্রকাশের বছর দুয়েকের মধ্যে সম্পাদক বদলের ফলে পত্রিকা একরকম সংকটে পড়ে। এই সময় পত্রিকার হাল ধরেন দুই ‘মন্টু’— অনিল ও ভবেন্দু ভট্টাচার্য।

অনিল ভট্টাচার্য ও ভবেন্দু ভট্টাচার্য, দুজনেই নবদ্বীপের মানুষ। দু’জনেই নবদ্বীপের যোগনাথতলার বাসিন্দা। লেখালেখি এবং একই মানসিকতার মানুষ হওয়ায় দু’জনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের সখ্য। তবে দুজনের পরিবারই বিভিন্ন কারণে নবদ্বীপের বাস উঠিয়ে কলকাতাবাসী হয়। ১৯৫১-৫২ নাগাদ অনিল ভট্টাচার্যরা নবদ্বীপ ছেড়ে কলকাতার বাগবাজারে বসবাস শুরু করেন। অন্যদিকে ভবেন্দু ভট্টাচার্যের বাবা ডাঃ সুধাকর ভট্টাচার্য নবদ্বীপের পাট চুকিয়ে কান্দির জমিদার সিংহ পরিবারের কাছে আসেন বসবাসের জন্য। আর এরই ফলে বাগবাজারের মন্টু এবং পাইকপাড়ার মন্টু আবার এলেন কাছাকাছি।

বয়সে অনিল ভট্টাচার্য ছিলেন সামান্য ছোটো। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর জন্ম। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে নবদ্বীপের হিন্দু স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই তিনি স্বয়ংসেবক হন। খুবই চটপটে ও নিষ্ঠাবান অনিল ভট্টাচার্য সঙ্ঘের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষা শেষ করেন বেশ সাফল্যের সঙ্গেই। হয়ে ওঠেন শ্রীগুরুজী এমএস গোলওয়ালকরের বিশেষ স্নেহধন্য। আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে দায়িত্ব। তারই মধ্যেই বিএসসি পাশ করেন অনিল ভট্টাচার্য।

নবদ্বীপ থেকে অনিল ভট্টাচার্যরা যখন কলকাতায় আসেন সে সময় কলকাতায় সঙ্ঘের চতুর্থ উপশাখা ছিল বাগবাজারে। সেই শাখার সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন তিনি।

প্রসঙ্গত, অনিল ভট্টাচার্যের পরিবার ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাগবাজারের বাসিন্দা হন বলে যে তথ্য ‘স্বস্তিকা’ (কালিদাস বসু : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪১২) পত্রিকায় রয়েছে, তাতে সম্ভবত সালের ব্যাপারে কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। কেননা, এর বছর কয়েক আগে থেকেই অনিল ভট্টাচার্য কলকাতাবাসী। হতে পারে, তাঁর পরিবার এসেছিল তাঁর আসার বেশ কয়েক বছর আগে। হয়তো বাগবাজার শাখার দায়িত্ব নেবার জন্যই তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল।

একইসঙ্গে বলতে হয়, ভট্টাচার্যরাও সম্ভবত ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের আগেই পাইকপাড়াবাসী হয়। পাইকপাড়াতেও সে সময় সঙ্ঘের একটি শাখা ছিল। সেই শাখার সঙ্গে ভবেন্দু ভট্টাচার্যও যুক্ত ছিলেন। আর সেই সূত্রেই কলকাতায় অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে ভবেন্দু ভট্টাচার্যর আবার যোগাযোগ হয়। সঙ্ঘ কাজের সঙ্গে সাহিত্যসাধনাতেও মগ্ন থাকতেন তাঁরা দু’জনে।

কলকাতায় দুই মন্টুর এই ঘনিষ্ঠতা স্বস্তিকার কাছে যেন হয়ে উঠল মণিকাঞ্চন যোগ। ‘স্বস্তিকা’ যাত্রা শুরুর প্রথমেই হোঁচট খায় সম্পাদক হেন্দ্রেনাথের চলে যাওয়ায়। দ্বিতীয় সম্পাদক ভৈরব ভট্টাচার্যও সরকারি চাকরি করতে চলে গেলে ‘স্বস্তিকা’ সত্যিই দাঁড়াল সংকটের হাঁ-মুখের সামনে। সেই সময় ‘স্বস্তিকা’কে স্বস্তি দিতে যিনি এগিয়ে এলেন তাঁর নাম একনাথজী রানাডে।

স্বস্তিকার ৬০ বছর উপলক্ষ্যে মহাজাতি সদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, কালিদাস বসু, মাননীয় সুদর্শনজী, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, তরুণ বিজয় ও সুবীর ভৌমিক।

ফঃ ৪

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে একনাথজী রানাডে পূর্বাঞ্চলের প্রচারক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। আর এসেই তিনি 'স্বস্তিকা'র সংকটটা বুঝতে পারেন। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন, 'স্বস্তিকা'র দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একজন 'ধ্যেয়নিষ্ঠ' যুবকের প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজন মোটানোর জন্য তিনি বাছলেন অনিল ভট্টাচার্যকে। সবদিক বিবেচনা করেই একনাথজীর মনে হয়, ওই সময় 'স্বস্তিকা'র জন্য তাঁর মতো একজন যুবকেরই প্রয়োজন। কর্মঠ, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান। লেখার হাতটাও যথেষ্ট ভালো। তার চেয়েও বড়ো কথা, ওই সময় তাঁর আর্থিক চাহিদাও তেমন নেই। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল 'স্বস্তিকা'র জন্য এরচেয়ে ভালো পছন্দের আর কেউ হতে পারে না।

একনাথজীর কথায় অনিল ভট্টাচার্যও রাজি। টাকাকড়ি তেমন পাওয়া না গেলেও পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে নিজের আদর্শ এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ মিলবে ভেবেই সাগ্রহে 'স্বস্তিকা' সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। এটা ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের কথা।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ 'স্বস্তিকা'র জীবনে এলো নতুন এক সমস্যা। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের জীবনে নতুন করে ঘনিয়ে এল অমবস্যার অন্ধকার। হাজারে হাজারে অত্যাচারিত, ছিন্নমূল হিন্দু জনগণ একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতোই আছড়ে পড়তে থাকে এদেশের মাটিতে। সব হারানো, দুঃস্থ, মৌন-ম্লান-মূক মুখের ভাষাকে বাঙ্ময় করতে এগিয়ে আসবেন কে তাঁর মানবিক, দরদি লেখনী নিয়ে? 'স্বস্তিকা' গোষ্ঠীর তখন সীমিত ক্ষমতা, এ অবস্থায় কে আসবেন অর্থের দিকে না তাকিয়ে? কে আসবেন 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী হিসেবে।

সেই প্রয়োজনের মুহূর্তে এক মন্টুর (ভবেন্দু ভট্টাচার্য) কথা মনে এল আরেক মন্টু অনিল ভট্টাচার্যর। ভবেন্দু ভট্টাচার্য তখন নাট্যকার, কবি, শিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজের পায়ের তলায় বেশ শক্ত মাটির সন্ধান পেয়েছেন। তাই তিনিই হতে পারেন যোগ্য ব্যক্তি।

স্বস্তিকা দপ্তরে মাননীয় শেষাদ্রিজী। উল্টেপাল্টে দেখছেন স্বস্তিকা। তখন ট্যাবলয়েড আকারে প্রকাশিত হতো।

কেবল অনিল ভট্টাচার্য নয়, 'স্বস্তিকা'র বহু শুভানুধ্যায়ীও ভবেন্দু ভট্টাচার্যের কথাই বলেন। শুধু একটাই প্রশ্ন, 'স্বস্তিকা' তাঁকে যে দক্ষিণা দেবে তা দিয়ে তাঁকে আনা অথবা এলেও আটকে রাখা যাবে কী?

এসবই ভবিষ্যতের ভাবনা। একনাথজী বেশ জোর দিয়েই মন্টুকে বলেন তাঁর বন্ধু মন্টুকে নিয়ে আসার জন্য। একনাথজীর পরামর্শে অনিল ভট্টাচার্য নিয়ে এলেন ভবেন্দু ভট্টাচার্যকে। সেদিনের কথায় কালিদাস বসু লেখেন, '—মন্টু-স্বস্তিকা সম্পাদকীয় বিভাগে সাহায্য করার জন্য ওঁর পূর্বপরিচিত বন্ধু... ভবেন্দুদাকে নিয়ে আসে। ২৬ বিধান সরণির তিনতলার উত্তর দিকের ছোটো ঘরে একনাথজী ভবেন্দুদার সঙ্গে একান্তে অনেকক্ষণ কথা বলেন। তারপর থেকেই ভবেন্দুদা স্বস্তিকা সম্পাদনা বিভাগে নিবেদিত প্রাণ। স্বস্তিকার সেবায় স্থির, ধীর, অচঞ্চল। ...একনাথজীর পথ নির্দেশই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। ভবেন্দুদা-মন্টুর দু'জনের যৌথ উদ্যমে স্বস্তিকার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকল।' (কালিদাস বসু : ভবেন্দুদা মায়ের কোলে, স্বস্তিকা ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪১২)।

প্রথমে তেমন প্রয়োজন না থাকলেও পরে পারিবারিক দায় বহনের জন্য অনিল ভট্টাচার্য যোগ দিলেন 'এশিয়া' পত্রিকায়। সেটা ১৯৫০-এর কথা। নতুন সম্পাদক হলেন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সবকিছু একলা হাতে সামলাতে হলো ভবেন্দু ভট্টাচার্যকেই। তখনকার কথায় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রান্ত প্রচারক অধ্যাপক অমল কুমার বসুর মন্তব্য, —'এখন ভবেন্দুদা একেবারে একা। কিন্তু তিনি দমলেন না। সব্যসাচীর মতো এক হাতে বল্গা ও অন্যহাতে অস্ত্র ধরলেন চতুর্ভুজ হয়ে। লেখন, অলংকরণ, লেখক-সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে এমনকী রাতের পর রাত জেগে পত্রিকা প্রকাশনায় মনোনিবেশ করলেন। সঙ্গী হিসেবে অনেকেই ছিলেন কিন্তু সব দায় ছিল ভবেন্দুদার। আর তা তিনি হাসিমুখেই বহন করেছেন। আজকের সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র, রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অনেকে নবীন সাংবাদিক হিসেবে ভবেন্দুদার কাছেই সাংবাদিকতার হাতে খড়ি নিয়েছেন। সাংবাদিকতার সূক্ষ্ম দিকগুলি ভবেন্দুদার কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন। এহেন ভবেন্দুদা কিন্তু দীর্ঘ চারযুগ ধরে শক্ত হাতে হাল ধরেছেন। স্বস্তিকাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। শয়নে-স্বপনে জাগরণে আছে 'স্বস্তিকা' নিপুণ কাণ্ডারির মতো তিনিই সবরকম ঝড় তুফানের মধ্যেও স্বস্তিকাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।' (ভূমিকা : নির্বাচিত রচনা ভবেন্দু ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-৫ ও ৬)।

বস্তুত স্বস্তিকাকে একটি সচল, সর্বাঙ্গসুন্দর, নির্ভীক, সৎ- সাংবাদিকতার বাহক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভারতীয় আদর্শর যোগ্য মাধ্যম করে তোলার ক্ষেত্রে ভবেন্দু ভট্টাচার্যের ভূমিকার কথা ভোলা যাবে না কোনোদিন।

নামে সম্পাদক তিনি ছিলেন খুবই অল্পদিন, কিন্তু ১৯৫০ থেকে আমরণ তিনিই ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের আসল চালিকাশক্তি।

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সম্পাদক হয়েছেন অসীম কুমার মিত্র। তারপর সম্পাদক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় ভবেন্দু ভট্টাচার্যের। কিন্তু আগাগোড়াই এমনকী তাঁর পর বিজয় আঢ্য সম্পাদক হওয়ার পরও ভবেন্দু ভট্টাচার্যই ছিলেন পত্রিকার মুলস্তম্ভ। আর সে কারণেই ভবেন্দু ভট্টাচার্য এবং স্বস্তিকা যেন সমার্থক হয়ে ওঠে। ১৯৭৫ থেকে আমরণ (৩ নভেম্বর ২০০৫) স্বস্তিকার অফিসই ছিল তাঁর ঘরবাড়ি। সেখানেই ঘটে তাঁর দেহাবসান।

তিনি কীভাবে নতুন লেখকদের উৎসাহিত করতেন তার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব কুমার চট্টোপাধ্যায়। নিজের প্রাথমিক লেখক জীবনের কথায় তিনি বলেন, 'তাঁর লেখা' একটার পর একটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তখন ভবেন্দুদা কী দরদে তাঁকে কাছে বসিয়ে চা-বিস্কুট খাইয়ে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চর্চার পথনির্দেশ দিয়েছেন।' (স্বস্তিকা, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪১২)

প্রথম স্বস্তিকা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ট্যাবলয়েড আকারে। তাতে থাকত সাপ্তাহিক নানা খবরের বিশ্লেষণ, থাকত এমন সব খবর, যা দৈনিক পত্রপত্রিকাগুলি এড়িয়ে যায় সচেতন অথবা অজ্ঞানতাজনিত কারণে। থাকত ভারত সংস্কৃতি স্পষ্ট নানা তথ্যমূলক সমৃদ্ধ নিবন্ধ। সাধারণ পাঠকের চাহিদার কথা মনে রেখে মেয়েদের পাতা অঙ্গনা, খেলাধুলার পাতা, ছোটোদের পাতা নবাঙ্কুর, ধর্মসংস্কৃতির জন্য পরম্পরা ইত্যাদি বিভাগে নিয়মিত প্রকাশ করা হতো এবং এখনও তা অব্যাহত। সেসব লেখার মধ্যে অনেকগুলিই গুণমানে বাজারের প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকার চেয়েও উন্নত। পত্রিকায় 'গূঢ়পুরুষ' নামে বিশিষ্ট সাংবাদিক রণজিৎ রায়, অগ্নিশর্মা নামে অসীম মিত্র প্রমুখ নিয়মিত লিখতেন এ পত্রিকায়।

প্রথম দিকে স্বস্তিকার সম্পাদকীয় দপ্তর ছিল ৭৬ নং বিধান সরণিতে চারতলায় প্রথম ১২নং ঘরে। বর্তমান সম্পাদকীয় দপ্তর ২৭/১বি, বিধান সরণিতে একসময় ছিল স্বস্তিকার নিজস্ব ছাপাখানা। প্রবীণদের আক্ষেপ যথেষ্ট উন্নতমানের ছাপাখানা হলেও সঠিক ব্যবসায়িক সাফল্য না পাওয়া এবং নতুন উন্নত

স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগে ভবেন্দুদার সঙ্গে মাননীয় মোহনজী।

প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে সে ছাপাখানা তুলে দিতে হয়। ওই বাড়িতে যেখানে বিদ্যার্থী পরিষদের অফিস ছিল, ওখানেই ছিল প্রেস ও ফ্ল্যাটসেড মেশিন।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বস্তিকাতেও চলতি ভাষারই ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু মূলত ভবেন্দু ভট্টাচার্যর অভিমতকে মান্যতা দিয়েই এখনও পত্রিকার সম্পাদকীয় সাধু ভাষাতেই লেখা হয়।

স্বস্তিকা কখনোই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। যাঁরা স্বস্তিকাকে রক্ষণশীল বলে মনে করেন তাঁরা চোখ খোলা রাখলে দেখবেন, স্বস্তিকা কোনো সময়ই নতুনকে অস্বীকার করেনি। বরং যুগের সঙ্গে তাল রেখেই মুদ্রণ প্রযুক্তি থেকে পত্রিকার অবয়ব, সবকিছুতেই আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপ রেখে চলেছে।

স্বস্তিকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল বাংলা ২৭ চৈত্র ১৪১৭ সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়, 'হিন্দুত্ব তথা জাতীয় চেতনার প্রচার ও প্রসারে সমর্পিত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির বিগত রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে স্থির করা হয় যে যত শীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী নববর্ষ সংখ্যা ১৪১৮ (১৮ এপ্রিল ২০১১) থেকে স্বস্তিকা প্রতিটি

কল্যাণী শিবিরে স্বস্তিকার স্টল। (২০১২)

সংখ্যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। ...স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট শুধু পুস্তকাকারে নয়, পত্রিকার বেশ কিছু পৃষ্ঠা এখন রঙিন। স্বস্তিকা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পারে তার জন্য ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের পাঁচ এপ্রিল ভারতীয় ট্রাস্ট আইন (১৮৮২) অনুযায়ী 'স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট' নামে একটি অছি পরিষদ গঠিত হয়। এই অছি পরিষদে একজন অছি সম্পাদক হবেন। এছাড়া আর কোনো পদাধিকারীর স্থান ট্রাস্ট ডিডে নেই। কিছুদিন আগে অবশ্য পত্রিকাটি 'ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বস্তিকা তার যাত্রালগ্নে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দৃঢ় পায়ে এবং নির্ভীকভাবে এই সমস্যা নিরসনে যে ভূমিকা নিয়েছিল তা এখন ইতিহাস।

একই সময় গোয়ার মুক্তি আন্দোলন নিয়েও সক্রিয় ভূমিকা নেয় স্বস্তিকা। পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের একাদশ সংখ্যায় (১৫ নভেম্বর ১৯৪৯) তৃতীয় পৃষ্ঠায় বড়ো শিরোনামে প্রকাশিত হয় 'পর্তুগিজ সরকারের নৃশংস দমননীতি' নামে একটি সংবাদ। এরপর থেকে গোয়ার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ক্রমাগত নানা সংবাদ প্রকাশ করে জনমত সংগঠিত করে। পত্রিকার সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪) প্রকাশিত হয় দাদরা এবং নগর হাভেলির মুক্তির সংবাদ। গোয়াকে মুক্ত করার ব্যাপারে প্রথমদিকে ভারত সরকারের তেমন সক্রিয়তা ছিল না। কিন্তু স্বস্তিকার ক্রমাগত প্রচার এবং মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে জনমত প্রায় বিক্ষোভে পরিণত হলে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সরকার সেনা অভিযান চালিয়ে মুক্ত করে গোয়াকে। গোয়া মুক্তি আন্দোলনে স্বস্তিকা অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ও বলিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কেবল সংবাদ নয়, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও স্বস্তিকা স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে চলেছে। ১৩৫১ সালে স্বস্তিকা প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে অনিল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়। অবশ্য ভবেন্দু ভট্টাচার্য ছিলেন এর মূল হোতা। প্রথম সংখ্যাতে লেখকদের মধ্যে ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গজেন মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ। প্রথম সংখ্যার দাম ছিল দেড় টাকা।

পরবর্তীকালে শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে লেখেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বিমল কর, বিমল মিত্র, পরিমল গোস্বামী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ, কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস, কৃষ্ণধর, রঘুনাথ গোস্বামী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডী লাহিড়ী, কণা বসুমিত্র, মানবেন্দ্রনাথ পাল, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গের প্রায় সমস্ত প্রথম সারির লেখক-লেখিকা। শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায় প্রমুখ বিদগ্ধজনরাও। আর এইসব লেখকরা স্বস্তিকায় লেখা দেন ভবেন্দু ভট্টাচার্যের যোগাযোগের ফলেই।

স্বস্তিকা তার জন্মলগ্ন থেকেই রাজরোষে পড়ে। পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষায় স্বস্তিকা যে ভূমিকা নেয়, তাতে কেন্দ্রের নেহরু সরকার তাতে পত্রিকার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠে। পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য রাজ্যের বিধান রায় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিও করে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে এক চিঠিতে অভিযোগ করেন, শিয়ালদহ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে গমনরত মুসলমানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের 'ভয়ানক অভিযোগ' উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগী আসতুম সালাম তাঁর কাছে যে অভিযোগ করেছেন তাতে তিনি (নেহরু) খুবই ক্ষুব্ধ। পাকিস্তান হয়েছে বলেই এদেশে মুসলমানদের অপমান করা হবে, তাও তাঁদের জমানায়, এমন সাহস কার? তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা প্রচারের জন্য কলকাতার কয়েকটি পত্রিকার উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

নেহরু ওই চিঠিতে লেখেন, 'I gave note Amal Holm to-day to be shown to some newspaper editors. I feel that Calcutta papers are responsible for a great deal of mischief and this must be brought home to them. They are very irresponsibility with fere. Among the worst papers the RSS Swastika, Jugantar, Basumati and Amrita Bazer Patrika' (ড. সুনন্দ সান্যাল : দি সিকল অ্যান্ড ক্রিসেন্ট : কমিউনিস্ট, মুসলিম লিগ অ্যান্ড ইন্ডিয়াজ পার্টিশন (পৃষ্ঠা-৯-১১)।

কেবল যে ওইসময় তা নয়, ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় এবং ১৯৯২-এ বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পরও প্রশাসন স্বস্তিকার প্রতি খড়্গহস্ত হয়। স্বস্তিকার কার্যালয়ে তালাও লাগানো হয়। কিন্তু তাতে স্বস্তিকার প্রকাশ বন্ধ করার প্রয়াস সফল হয় না। স্বস্তিকা যথারীতি প্রকাশিত হয় পত্রিকা পরিচালকদের অদম্য নিষ্ঠা ও কর্মপ্রয়াসের ফলে।

যে কোনো পত্রিকা বিশেষ করে অবাণিজ্যিক বাংলা পত্রপত্রিকার পক্ষে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ৭৫ বছরে পা রাখা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে স্বস্তিকা। তার প্রাণশক্তির আভাস, আগামীতে এমন আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বছর পার করবে এই পত্রিকা। সম্পাদক বা কর্মী বদল হলেও একটি পত্রিকা চলে তার আপন প্রাণশক্তি, আদর্শ আর নিষ্ঠার কারণে। স্বস্তিকার ক্ষেত্রে এর কোনোটারই যে অভাব নেই তা মানতে হবে সকলকেই।

স্বস্তিকার এই পঁচাত্তর বছরের যাত্রাপথে ন'জন এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এঁরা হলেন হেমেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, ভৈরব চন্দ্র ভট্টাচার্য, অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, ড. বিজয় আঢ্য, রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং ড. তিলক রঞ্জন বেরা। এঁদের সঙ্গে আরও বহু নবীন এবং প্রবীণ সাংবাদিক ও কর্মী তাঁদের প্রাণঢালা পরিশ্রমে পত্রিকার জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে দেন। সেইসঙ্গে অসাংবাদিক কর্মীরাও পত্রিকার পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করেছেন। এঁরাই হলেন স্বস্তিকার আসল প্রাণভোমরা। চরৈবেতির মন্ত্রে সূর্যমুখী স্বস্তিকা এভাবেই এগিয়ে চলুক সামনে।

পুনশ্চ : এটি স্বস্তিকার সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, খসড়া মাত্র।

তথ্যঋণ : ড. বিজয় আঢ্য, দুর্গাপদ ঘোষ, রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বস্তিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

(লেখক একজন প্রবীণ সাংবাদিক)

মানুষকে পথ দেখাতে জন্ম নিয়েছিলেন কৃষ্ণ

সরোজ চক্রবর্তী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিকেই জন্মাষ্টমী বলা হয়। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে মথুরায় কংসের কারাগারে মাতা দেবকীর অষ্টম সন্তানরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। ভারতবর্ষের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশেও মহাসমারোহে এই উৎসব পালিত হয়।

অষ্টমীতিথিতে রাত্রি বারোটায় আবির্ভূত হন শ্রীকৃষ্ণ। সেই শুভক্ষণকে স্মরণে রেখে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে গঙ্গাজলে স্নান করানো হয়। তারপর পরানো হয় নতুন পোশাক। ময়ূরের পালক, মুরলী, মুকুট ও চন্দন দিয়ে সাজানো হয় গোপালকে। প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয় ফল, মাখন ও মিষ্টি।

মথুরা ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে উৎসব পালন করা হয় প্রতিবছর।। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মথুরায় হলেও তাঁর শৈশব কেটেছে বৃন্দাবনে। যৌবনে আবার তিনি মথুরায় আসেন। পুরনো পুঁথি ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ৩২১৮ খ্রিস্টপূর্বাদে এবং তিনি লীলা সংবরণ করেন ৩১০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তিনি যাদব বংশের বৃষ্ণি গোত্রভুক্ত ছিলেন।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু। দ্বাপরে তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর আবির্ভাবের সময় চারিদিকে অরাজকতা, নিপীড়ন ও অত্যাচার চরম সীমা অতিক্রম করেছিল। অশুভ শক্তির হাত থেকে মানবজাতিকে বাঁচাতেই তাঁর আগমন। তাঁর মামা স্বয়ং অত্যাচারী শক্তির প্রতিভূ ছিলেন। তার বোন দেবকীর গর্ভজাত সন্তানই তার বিনাশের কারণ হবে, এই দৈববাণী শুনে তিনি দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করে রাখেন। ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথির দুর্যোগপূর্ণ রাতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর বসুদেব তাঁকে নন্দালয়ে স্থানান্তরিত করেন। কিশোর বয়সে কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় এসে কংসকে হত্যা করে অত্যাচারের অবসান ঘটান।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে প্রতিবছর মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময়ে জন্মাষ্টমী পর্বটি পড়ে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কর্মকাণ্ড গান, কীর্তন, গীতিনাট্য, নাটক, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। কোথাও রাসলীলা, কংসবধ পালাকীর্তনও হয়। মথুরা, বৃন্দাবন, মণিপুর-সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে করা হয়। রাসলীলায় তাঁর বাল্যবয়সের লীলাকীর্তন হয়। আবার দহিহাণ্ডিতে তাঁর সখাপ্রীতির ভাব দর্শিত হয়। এই পরম্পরাকে তামিলনাড়ুতে উদিয়াদি নামে পালন করা হয়। কৃষ্ণের জন্ম হওয়ায় নন্দরাজ গোকুলবাসীকে উপহার বিতরণ করেছিলেন, সেই ঘটনার স্মরণে পরদিন নন্দোৎসব পালিত হয়।

বৈষ্ণবদের কাছে জন্মাষ্টমী একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব নানাভাবে উদ্যাপন করা হয়ে থাকে। এদিন ভক্তরা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম ব্যক্ত করার জন্য সারাদিন উপোস থেকে পূজা পার্বণ করে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের আসরে গিয়ে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করে নিজেদের ধন্য করেন। এদিন বাড়ির মহিলারা দরজার বাইরে, রান্নাঘরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এঁকে দেন যা শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জন্মাষ্টমী উৎসবকে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কৃষ্ণাষ্টমী, গোকুলাষ্টমী, অষ্টমরোহিণী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী প্রভৃতি নামে পালন করা হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বা পরম সত্তা বলে মনে করা হয়। তিনি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা

গ্রন্থের প্রবর্তক। তিনি বৃন্দাবনের অধীশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ। তিনি ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রধানপুরুষ।

কৃষ্ণ শব্দের নানা অর্থ রয়েছে। সংস্কৃত কৃষ ধাতু থেকে কৃষ্ণ শব্দটি এসেছে। কৃষ ধাতুর অর্থ হচ্ছে আকর্ষণ করা। কৃষ্ণের সঙ্গে ণ প্রত্যয় করে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ সকলকে টেনে নেওয়া। অর্থাৎ যিনি মহাবিশ্বে সবকিছুকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছেন। বলছেন— আমিই জীবের শেষ আশ্রয়। আমিই তোমাকে সব বিপদ থেকে বক্ষা করব। তুমি আমার শরণাপন্ন হও। কৃষ্ণের আর একটি অর্থ হলো কালো বা ঘননীল। আর একটি অর্থ হচ্ছে কৃষিভূ। এখারে কৃষ ধাতুর অর্থ হলো 'আমি আছি'। আই এক্সিস্ট। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আমি আছি। অর্থাৎ কৃষ্ণ আছেন বলেই আমার অস্তিত্ব। কৃষ্ণের অস্তিত্ব না থাকলে জীবজগতের কোনো অস্তিত্ব থাকত না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে কৃষ্ণ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সর্বকর্ষক। ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণকে প্রায়শই বংশীবাদনরত এক কিশোর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার ভগবদ্গীতায় তিনি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় এক পথপ্রদর্শক রূপে দণ্ডায়মান। সমগ্র মহাভারতে তিনি এক কূটনীতিজ্ঞ রূপে পরিচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথি রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি একাধারে দেবগুণসম্পন্ন শিশু, রঙ্গপ্রিয় বালক, আদর্শ প্রেমিক, দিব্য নায়ক এবং পরম ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ সংক্রান্ত উপাখ্যান বিবৃত রয়েছে মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে (৫।৭১।৪) বলা হয়েছে, কৃষ্ণ শব্দটি 'কৃষ্ণ' ও 'ণ' এই দুটি মূল থেকে উৎপন্ন। কৃষ শব্দের অর্থ টেনে আনা বা কর্ষণ করা। সেই শব্দটি ভূ শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'ণ' শব্দটিকে নিবৃত্তি শব্দের প্রতিভূ ধরা হয়। মহাভারতের শ্লোকটি চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীল প্রভুপাদের টীকায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ভূ শব্দটির নিহিত অর্থ আকর্ষণীয় ব্যক্তি। ভাগবত পুরাণের আত্মারাম স্তবে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। বল্লভ সম্প্রদায়ে ব্রহ্মসম্ভব মন্ত্রে কৃষ্ণনামের মূল শব্দগুলিকে বস্তু, আত্মা ও দিব্য কারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, পাপের বিনাশশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু সহস্রনামের ৫৭তম নামটি হলো কৃষ্ণ, যার অর্থ আদি শঙ্করাচার্যের মতে 'আনন্দের অস্তিত্ব'।

কৃষ্ণের একাধিক নাম ও অভিধা রয়েছে। সর্বাধিক প্রচলিত নাম দুটি হলো গোবিন্দ (গো অন্বেষক) ও গোপাল (গো রক্ষাকারী)। এই নাম দুটি ব্রজে কৃষ্ণের প্রথম জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো কোনো নামের আঞ্চলিক গুরুত্বও রয়েছে। যেমন জগন্নাথ নামটি। ওড়িশায় ওই নামে বিশেষভাবে পূজিত হন শ্রীকৃষ্ণ। জগন্নাথের রূপ ধারণও শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি লীলা।

কৃষ্ণকাহিনির আংশিক ও পুরনো সংস্করণ জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায়। জৈনগ্রন্থে কৃষ্ণকে বাইশতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মামাতো ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জৈনমতে নেমিনাথই কৃষ্ণকে সমস্ত জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা কৃষ্ণ পরে গীতারূপে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। অঞ্চলভেদে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকার বিগ্রহও দেখা যায়। যেমন ওড়িশায় জগন্নাথ, মহারাষ্ট্রে বিঠোবা বা বিঠ্ঠল, রাজস্থানে শ্রীনাথজী। মণিপুরী বৈষ্ণবরা একা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে না। তাঁদের আরাধ্য যুগলমূর্তি রাধাকৃষ্ণ। মন্দিরে পূজিত বিগ্রহ সাধারণত দণ্ডায়মান অবস্থার। কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণ একা, আবার কোথাও কোথাও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরাও তাঁর সঙ্গে পূজিত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাধা, বলরাম ও সুভদ্রা অথবা তাঁর প্রাধানা মহিষী রুক্মিণী ও সত্যভামা। শ্রীকৃষ্ণের অধিকাংশ বিগ্রহেই তাঁর রং কালো দেখা যায়। অন্যদিকে ছবিতে প্রধানত তাঁর গায়ের রং ঘননীল।

১৯৬৫ সালে ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের বাইরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও ভাবধারা প্রচার করেন। তিনি আপামর মানুষের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি জাগরণের জন্য ইসকন নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ইসকনের মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় ঘটানো। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের জপ পশ্চিমি দুনিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। এই মহামন্ত্রটি বিটলস খ্যাত জর্জ হ্যারিসন এবং জন লেলনের একসময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬৯ সালে জর্জ হ্যারিসন লন্ডনের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের ভক্তদের দ্বারা একটি রেকর্ডিং তৈরি করেছেন। 'হরেকৃষ্ণ মন্ত্র' শিরোনামে গানটি যুক্তরাজ্য মিউজিক চার্টে শীর্ষ বিশে পৌঁছেছিল। জার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়াতেও জনপ্রিয় হয়েছে। ইসকন বিশ্বের বহু দেশে কৃষ্ণমন্দির তৈরি করেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও শিল্পে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় কৃষ্ণের অস্তিত্ব রয়েছে। থাইল্যান্ডে সূর্য ও বিষ্ণুর মূর্তির সঙ্গে কৃষ্ণমূর্তির মিল রয়েছে। উত্তর থাইল্যান্ডের ফেচাবুন অঞ্চলের সি থেপ এবং ক্লাংনাই সাইটে প্রচুর ভাস্কর্য ও আইকনে কৃষ্ণমূর্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এগুলো অষ্টম শতাব্দীর বলে মনে করা হয়।

এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে মানবজাতির পথপ্রদর্শক রূপে। তাই সারা বিশ্বের মানুষ আজ তাঁরই শরণ নিয়ে তাঁরই পথে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। ◻

ভূকৈলাশের যমজ শিবমন্দির

মদনমোহন সিংহ

'বহুদিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে/বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে/দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।/দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষের উপরে, একটি শিশির বিন্দু।' বসবাস স্থানের কাছাকাছি বৃহৎ অজানাকে জানতে পারলে স্পর্শ করলে এবং সেই জায়গায় ভ্রমণ করতে যে অনুভূতি যে আনন্দের আবেশ হয় তা রবিঠাকুরের উপরোক্ত বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখে এলাম যমজ ১৮ ফুটের জোড়া শিবলিঙ্গ। ঘটনাটি এরূপ আমাদের কলকাতার বাসায় একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকেন। তার কলকাতাকে চেনার, জানার বোঝবার এক অনবদ্য ইচ্ছাতেই আমি তাকে কলকাতার কালীঘাটে নিয়ে যাই। সেখানে মা কালীর দর্শন ও প্রণাম করি। অতঃপর আমার মনে হলো আজ সোমবার আবার শ্রাবণ মাস, এক কথায় শিবময় ভারতবর্ষ এই সময়। আপনারা জানেন যে মা দুর্গার পূজা ৪ দিন হয় কিন্তু ভোলানাথের পূজা সারা শ্রাবণ মাস ধরে হয়। সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করতে আমি ও আমার বন্ধুটি ভূকৈলাস শিবমন্দিরের পথে যাত্রা করি। যদিও এর আগে আমি বহুবার এই মন্দিরে যাওয়ার সৌভাগ্যলাভ করেছি। তবে এখন এই ভূকৈলাশ শিবমন্দিরের প্রতি অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়েছে। তার কারণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণিত কথামৃতে এই ভূকৈলাশ স্থানটি মর্যাদা পেয়েছে। যাঁরা কথামৃত পড়েন তাঁদের জানাই মূল কথামৃত বইয়ের পিছনের দিকের (পেজ ইনডেস্ক) পাতায় ভূকৈলাশ বলে ২৩৭ পাতায় উল্লেখ আছে। ওই পৃষ্ঠাটি পড়লেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাজরার কথোপকথনের মধ্যে এই ভূকৈলাশ মন্দিরটি উল্লেখিত রয়েছে।

কলকাতা খিদিরপুর ট্রাম ডিপো সংলগ্ন এই বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূকৈলাশ যমজ শিব মন্দিরটি অবস্থিত। হাওড়া থেকে খিদিরপুর গামী বাসে বা মেট্রোতে হাজরা স্টেশন থেকে অতি সহজেই এই শিব মন্দিরে যাওয়া যায়। ভূকৈলাশের মহারাজা বাহাদুর জয়নারায়ণ ঘোষাল ২০০ বিঘা জমির উপরে ভূকৈলাশ রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'ভূকৈলাশ' নামটি সাধক রামপ্রসাদের দেওয়া। তিনি এই স্থান পরিদর্শন কালে জায়গাটির নাম দেন 'ভূকৈলাশ'। সুরধুনী কাব্যে ভূকৈলাশ রাজবাড়ির বর্ণনা দিয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র এই ভাবে— 'ভুবনে কৈলাশ শোভা ভু-কৈলাশধাম, সত্যের আলয় শুভ সত্য সব নাম।' এই বিশাল ভুভাগের মধ্যে আছে মূল তিনটি মন্দির। আগে রাজবাড়ি ছিল এখন তা ধ্বংসস্তূপে এবং অনেকাংশ জবরদখল কবলে।

জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫২-১৮২১) গোবিন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একই

সঙ্গে সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা, আরবি, ফার্সি ও ইংরাজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তার কাজে খুশি হয়ে দিল্লির দরবার থেকে তাঁকে তিন হাজারি মানসবদারি পাইয়ে দেন। যার স্মৃতি বহনকারী হিসেবে আজও দুটি কামান রাজবাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায়, এক সময় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট পদও অলংকৃত করেছিলেন জয়নারায়ণ। ১৭৮১-তে শিবগঙ্গার খনন ও যমজ শিবমন্দির স্থাপন। এই দুই যমজ মন্দির মুখোমুখি হলেও লিঙ্গের মুখ কিন্তু পুষ্করিণীর দিকে। বিশাল আটচালা রীতির মন্দির দুটি। কলকাতায় আটচালা মন্দির নির্মাণে ঘোষাল বংশকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। মন্দির দুটির নাম জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর মাতা ও পিতার নামানুসারে রাখেন। ত্রি-খিলানযুক্ত আটচালা মন্দির দুটির পূর্ব দিকটির নাম রাখেন রক্তকমলেশ্বর। এর শিবলিঙ্গের মুখ পশ্চিম দিকে। দ্বিতীয়টির গঠনশৈলী হুবহু এক। এটির নাম কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর। ১৮ ফুট উচ্চতার কষ্টিপাথরের যমজ শিবলিঙ্গ একটি মাত্র পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে, এটি এশিয়ার সর্বোত্তম শিবলিঙ্গগুলির মধ্যে অন্যতম। এই মন্দির মধ্যস্থ শিবগঙ্গা নামক পুষ্করণী দেখা যায়, যার জল বহু ব্যবহারে আজ দুষিত। এই পুষ্করণীর একপ্রান্তে একটি বড়ো নন্দীমহারাজা রয়েছে। অপর প্রান্তে জয়নারায়ণ ঘোষালের স্মৃতিমন্দির। যদিও এই অঞ্চলে এখন বিধর্মীদের অত্যাচারের ফলে এবং স্বধর্মীদের ভীরুতার ফলে জয়নারায়ণের সুন্দর স্মৃতিমন্দিরটি আজ বন্ধ। দর্শনার্থীরা এত সুন্দর একটি স্মৃতি মন্দির দর্শন করতে পান না। শুধু তাই নয়, এই পুষ্করণীর চারদিকে ছোটো ছোটো মন্দির ছিল। ঘড়ির কাঁটায় বিপরীত দিক থেকে ধরলে পরপর গণেশ, রামসীতা, হনুমান, সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণ ও দেবীদুর্গা, যেগুলি রাজস্থান থেকে বা নিয়ে নিয়ে এসে এখানে স্থাপন করা হয়, এখন সেগুলি অবলুপ্তির পথে।

এই শ্রাবণের পুণ্য তিথিতে ভূকৈলাশের যমজ ১৮ ফুট উচ্চতার মুখোমুখি দুটি শিবলিঙ্গে বেলপাতা, গঙ্গাজল, দুধ সবই বাবার মাথায় দেওয়া যায় আপন হাতে, পূজার মন্ত্র হলো—

দেবাদিদেবমহিভূষণমিন্দুকাশং
পঞ্চাননং পশুপতিং বরদং প্রসন্নম্
গঙ্গাধরং প্রণতপালকমাশুত্যেচং
বন্দে সদাশিব-হরিপ্রিয় চন্দ্রমৌলিম্।।

সাধু ও অবতারের প্রভেদ (কথামৃত, পৃষ্ঠা-২৩৭)

'ভূকৈলাশের সাধু সমাধিস্থ ছিল। সমাধি অনেক প্রকার। হৃষীকেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলে গিয়েছিল। কখন দেখি শরীরের ভিতর বয়ে চলছে যেন পিঁপড়ের মতো, কখনো-বা সড়াৎ করে, বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফায়। কখন মাছের মতো গতি। যার হয় সেই জানে, জগত ভুল হয়ে যায়। মনটা একটু নামলে বলি মা। আমায় ভালো কর।

হাজরার সঙ্গে সঙ্গে কথা— গুরুশিষ্য সংবাদ

ঈশ্বরই কর্তা। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, হাজরা— কিন্তু বোঝা বড়ো শক্ত। ভূকৈলাশের সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে একরকম মেরে ফেলা হলো। সাধুটিকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, কখনো মাটির ভিতর পোঁতে, কখনো জলের ভিতর রাখে, কখনো গায়ে ছেঁকা দেয়। এইরকম করে চৈতন্য করা হলো। এইসব যন্ত্রণায় ত্যাগ হলো। লোক যন্ত্রণাও দিলে, আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মারাও গেল।

Problem of evil and the Immortality of Soul শ্রীরামকৃষ্ণ— যার যা কর্ম, তার ফল সে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সাধুর দেহত্যাগ হলো। কবিরাজেরা বোতলের ভিতর মকরধ্বজ তৈয়ার করে। চারিদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভিতর যে সোনা আছে, সেই সোনা আগুনের তাতে আরও অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবিরাজ বোতলটি নিয়ে আস্তে আস্তে ভেঙে ভিতরের মকরধ্বজ রেখে দেয়। তখন বোতল থাকলেই-বা কি, আর গেলেই-বা কি? তেমনি লোক ভাবে সাধুকে মেরে ফেললে, কিন্তু হয়তো তার জিনিস তৈরি হয়ে গেল। ভগবান লাভের পর শরীর থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি?

ঈশ্বরকোটি (অবতারাদি) না হলে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরে লোকের মঙ্গলের জন্য।

মাস্টার : (স্বগত:) ঠাকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি?

হাজরা : ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে পারলেই হলো। অবতার থাকুন আর না থাকুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : (হাসিয়া) হাঁ হাঁ বিষ্ণুপুরে রেজিস্টরি বড়ো অফিস। সেখানে রেজিস্টার করতে পারলে, আর গোঘাটে গোল থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরার প্রতি— হাঁ সব মিটে গেলে তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক তিনিই ভালো, তিনিই মন্দ, তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ, জাগা ঘুম সব অবস্থা তাঁরই আকার তিনি এসব অবস্থার পার—

একজন চাষার বেশি বয়সে একটি ছেলে হয়েছিল। খুব আদর যত্ন করল তারপর সে ছেলে একদিন মরে গেল তার পরিবার খুব দুঃখ পেল এদিকে চাষার চোখে একবিন্দু জল নেই, নেই শোকের চিহ্ন, তা দেখে তার পরিবার প্রতিবেশীদের কাছে আরও দুঃখে বলল এমন সোনার ছেলে চলে গেল তবু চোখে এক বিন্দু জল নেই। তখন চাষাকে একথা তার পরিবার শুধালে তখন চাষা বললে আজ একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি রাজা হয়েছি আর আমার সাত পুত্র রয়েছে, তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, এখন বলো আমি এক ছেলের জন্য শোক করব না সাতছেলের জন্য। □

স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেদিনের স্বস্তিকা

প্রদীপ ঘোষ

স্বস্তিকায় লেখক হিসেবে আমার সম্পর্ক হয় বহু বছর আগে। পঞ্চাশের দশকে। তখন স্বস্তিকায় ছোটোদের একটি বিভাগ চালাবার দায়িত্ব ছিল। বিভাগটির নাম আজ ভুলে গেছি। তার অনেকদিন পরে স্বস্তিকার নিয়মিত লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হই এবং প্রায় আট বছর (১৯৭০-৭৮) সেই দায়িত্ব পালন করেছি। স্বস্তিকার প্রতি সংখ্যাতেই কিছু পরিমাণে লেখা দিতে হতো। আমাদের তিনজনের ওপরে এই দায়িত্ব ছিল। আমি, ভবেন্দু ভট্টাচার্য ও অসীম কুমার মিত্র (ভোলাদা)। এই তিনজন নিয়মিত লেখক ছাড়াও কিছু অনিয়মিত লেখক ছিলেন যাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখতেন। মনে আছে স্বস্তিকা অফিসে গেলেই ভবেন্দুদা বলতেন, কপি কই? কপি মানে লেখার পাণ্ডুলিপি। লেখা ছাড়াও প্রুফ দেখার দায়িত্বও ছিল আমাদের তিনজনের ওপরে। তখন স্বস্তিকার সম্পাদক ছিলেন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি লিখতেন না। তাঁর নামটা সম্পাদক হিসেবে থাকত নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেনের মতো। কয়েকবার রাজরোষে পড়ে স্বস্তিকার সম্পাদককে জেলে যেতে হয়েছিল। পদ মাহাত্ম্যে সনৎদাকেও কারাবাসে যেতে হয়। এখন স্বস্তিকা ম্যাগাজিন আকারে বের হয়। তখন তা ট্যাবলয়েডের মতো ছিল। স্বস্তিক মুদ্রণালয় নামে স্বস্তিকার নিজস্ব ছাপাখানাতেই তা ছাপা হতো। স্বস্তিকার এক তলাতে ছিল সেই ছাপাখানা। শ্রমিক অশান্তির জন্য সেই ছাপাখানা উঠে যায়। সেই বেদনাদায়ক ঘটনার মধ্যে ঢুকতে চাইছি না। 'কে চায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে?' তবে মনের মধ্যে ক্ষোভ এখনও জমা হয়ে আছে। চেষ্টা করলে কি স্বস্তিক মুদ্রণালয়কে বাঁচানো যেত না? থাক সেসব কথা।

আমাদের নানারকম দায়িত্ব একইসঙ্গে পালন করতে হতো। যেমন, সাব-এডিটর, রিপোর্টার। স্তম্ভলেখক, প্রবন্ধ লেখক, অনুবাদক ও প্রুফ রিডার। প্রুফ রিডিঙের কাজ ভবেন্দুদার কাছ থেকেই শিখেছি। লেটার প্রেসে পরপর অক্ষর সাজিয়ে কম্পোজ করা হয়। ভাঙা অক্ষরের সৌজন্যে কত 'বীরাঙ্গনা' 'বারাঙ্গনা' হয়ে কম্পোজ হয়ে যেত। ফলে প্রুফ দেখাতে সাবধানতা জরুরি ছিল। একবার তো 'বঞ্চিত' কথাটির ই-কার ভেঙে আ-কার হয়ে গিয়ে এক গালাগালের সৃষ্টি হয়েছিল। একজন স্বনামধন্য (অধুনা প্রয়াত) সাহিত্যিক স্বস্তিকার পূজা সংখ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে গল্প লিখতেন। একবার গল্পের মধ্যে দুষ্টুমি করে সঙ্ঘ সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেন। আমি তো কম্পোজ করতে পাঠানোর আগে ওই বিতর্কিত অংশটা কেটে দিলাম। তা জানতে পেরে ভবেন্দুদা বললেন, ওটা কাটা ঠিক হয়নি। ওটা কম্পোজ হয়ে এলে প্রুফ দেখার সময়ে বাদ দিয়ে দিতে। তাহলে মুদ্রণ প্রমাদ বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। এনিয়ে অবশ্য জল আর গড়ায়নি।

মনে আছে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের অনুলিখন করার জন্য তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেদিনই তিনি পদ্মপুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। ঘন ঘন শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ফোন আসছিল। সেগুলো সামলাতে সামলাতে প্রবন্ধ লেখালেন। এটা অবশ্য অনেক দিন আগের কথা। তখন আমি স্বস্তিকায় পাকাপাকি ভাবে আসিনি। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে অনেক বিখ্যাত লোকের সাক্ষৎকার নেবার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের বাড়িতে গিয়ে। যেমন, ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, কাশীকান্ত মৈত্র। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, হরিপদ ভারতী প্রমুখ। কাশীকান্ত মৈত্র তাঁর দুটি খুব প্রচলিত বই স্বাক্ষর করে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র খুঁজে খুঁজে ওঁর একটা ছবি দিলেন সাক্ষাৎকারের সঙ্গে ছাপার জন্যে, যাতে তখনও তাঁর মাথায় চুল ছিল।

ভবেন্দুদার ৭৫তম বর্ষ পূর্তিতে মহাজাতি সদনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। তাঁকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে বাঁ দিক থেকে সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক পবিত্র ঘোষ, একেবারে ডানদিকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন মনোজ ঘোষ।

যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় সেদিনই সেনা বিভাগের পক্ষ থেকে একদল সাংবাদিককে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল একটা বাসে করে। সেনাদের গাড়ির কনভয় স্থলপথে বাংলাদেশে ঢুকল। ওই কনভয়ের

ফঃ৫

মধ্যেই ছিল সাংবাদিকদের বাসটি। খুব ভোরে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে থেকে গাড়ি ছাড়ল। জনাকুড়ি সাংবাদিক ছিলেন। তার মধ্যে দুজন ছাড়া বাকি সকলেই বিদেশি। যথা ফরাসি, স্পেনীয়, ইংরেজ ইত্যাদি। দুজন ভারতীয়র মধ্যে স্বস্তিকার পক্ষ থেকে আমি, আর কলকাতার একটি হিন্দি সাপ্তাহিকের পক্ষ থেকে অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। আমরা প্রথমে যশোর যাই। তারপরে খুলনা। পথে মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে আমরা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে খান সেনাদের অত্যাচারের কথা শুনছিলাম। চলছিল ধ্বংসস্তূপের ছবি তোলাও। স্থানীয়দের কথাবার্তা বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে ইংরেজিতে অনুবাদও করতে হচ্ছিল আমাদের দুজনকে। খুলনায় তখন অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠান চলছিল ভিড়ে ঠাসা একটি মাঠে। সেটা দেখারও সুযোগ পেলাম। খুলনায় একটা চৌরাস্তার মোড়ে হঠাৎ বাঙ্গালি ও বিহারী মুসলমানদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। হঠাৎ পলায়মান বিহারি মুসলমানদের তাড়া করে বাঙ্গালি গুলিবর্ষণ শুরু করে। ওই দেখে সেনা অধিকারীরা আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাড়াতাড়ি আমাদের বাসে তুলে দিলেন। সেদিন গভীর রাতে কলকাতা ফিরলাম। সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানি কিছু মুদ্রা। সেই আমার প্রথম ও শেষ বাংলাদেশ ভ্রমণ।

কন্যাকুমারীকাতে বিবেকানন্দ শিলায় স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে স্বস্তিকার প্রতিনিধি হিসেবে যাই। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, তামিলনাড়ুর (তৎকালীন মাদ্রাজ) মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি ও একনাথ রানাডে। করুণানিধি তখন যুবক। তিনি প্রথমে ইংরেজিতে কিছু বলার পরে তামিলে ভাষণ শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনতার হর্ষোল্লাস। তখন তো উগ্রপন্থী ব্যাপারটা ছিল না। ফলে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কতবার মঞ্চে উঠে ঘোরাফেরা করলাম। কেউ পকেটে রাখা সাংবাদিক কার্ড দেখতে চাইল না। হাতের ক্যামেরাটাই যথেষ্ট। ওখানকার কনস্টেবলদের মাথায় তখন লম্বা লম্বা টুপি, হাতে একটা খেঁটে লাঠি। ব্যাস, ওইটুকুই অস্ত্র। পাশে টুপি খুলে রেখে দু' একজনকে ঘুমোতেও দেখেছি।

জরুরি অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধী সব পত্রপত্রিকার ওপর সেন্সর জারি করেছিলেন। ফলে ছাপার আগে কপি রাইটার্স বিল্ডিঙে জমা রেখে আসতে হতো। ওরা প্রয়োজনে সংশোধন করে ছাড়পত্র দিলে তবেই ছাপা যেত। একবার আমি একটু চালাকি করে বিনয়- বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের ইতিহাস লিখেছিলাম এই ভাবে— 'রাইটার্স বিল্ডিং, দমন পীড়নের পীঠস্থান, ১৯৩০'। ওঁরা সেন্সর করে ১৯৩০ কথাটা এগিয়ে এনেছিলেন আমার কৌশল ভেস্তে দিতে।

ইন্দিরা গান্ধীর পতনের পরে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। তখন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস সারা পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ করলেন। সর্বত্র বিপুল জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। তাঁর সফর সঙ্গী হয়েছিলাম স্বস্তিকার সাংবাদিক হিসেবে। তাঁর কলকাতায় অবস্থানকালে সাংবাদিক সম্মেলন, জনসভা, বিশিষ্ট নাগরিকদের সভা ইত্যাদি নিয়ে আমরা একটি বই প্রকাশ করেছিলাম— 'কলকাতায় শ্রী বালাসাহেব'। বইটির কোনো কপি এখন নেই। এর বেশ কিছু বছর আগে অর্থাৎ শ্রী গুরুজীর জীবদ্দশায় আমরা দুটি বই প্রকাশ করেছিলাম— 'সঙ্ঘ দর্শন ও হুমকি বনাম যুক্তি'। প্রথমটিতে নবাগতদের জন্য সঙ্ঘের আদর্শবাদ সহজ ভাষায় বোঝানো হয়েছিল। দ্বিতীয়টিতে সঙ্ঘের নানা সমালোচনার তথ্য-সহ জবাব। বর্তমান পরিস্থিতিতে বই দুটি বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বইগুলির কোনো কপি নেই। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তির কাছে বই দুটি থাকে তবে তা স্বস্তিকা অফিসে পাঠাবার অনুরোধ এই সঙ্গে জানিয়ে রাখছি। তাহলে ওই বইগুলির পুনর্মুদ্রণ করা হবে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও বদল হয়। আমরা স্বস্তিকার কপি লিখতাম কাগজে। এখন আমার ছেলে মাঝে মাঝে স্বস্তিকায় অর্থনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে। তবে কাগজে নয়, ই-মেলে।

আমরা যখন স্বস্তিকা পরিবারে ছিলাম তখন আর্থিক কৃচ্ছতার যুগ। কিন্তু আমাদের মুখের হাসি কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। নিখাদ হাসি ঠাট্টা ও কৌতুকের ধারা ছিল অবারিত। একবার আমার টেবিলে একটা পোস্টকার্ড এল। পাঠিয়েছে সিউড়ির জনৈক স্বয়ংসেবক। (নামটা এখন আর মনে নেই)। সে খুব কৃশকায় ছিল। চিঠিতে সে তার বিবাহে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ভবেন্দুদাকেও নিমন্ত্রণের কথা লিখেছিল। আমি পোস্টকার্ডটা পড়ে ওর মাথায় একটা নেটে লিখলাম— 'To Bhabenduda, for infomation and necessary action.' তারপর চিঠিটা ভবেন্দুদার টেবিলে ঠেলে দিলাম। উনি চিঠিটা মন দিয়ে পড়ে একটা নেটে দিয়ে ফেরত পাঠালেন। দেখলাম লেখা আছে— 'Stop him'।

স্বস্তিকার বহু পুরাতন কর্মী বিপুল গুহ ঠাকুরতা ছিল রসের খনি। একবার ভবেন্দুদার টেবিলের সামনে গিয়ে বলল, ভবেন্দুদা, আপনাকে একটু বিরক্ত করব? উনি বললেন, হ্যাঁ বল, কী বলবে। ও টেবিলে ধুমধাম আওয়াজ করতে করতে বলল, বিরক্ত করছি। কিছু বলতে তো আসিনি। বিরক্ত করতে এসেছি।

স্বস্তিকার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভবেন্দুদার কথা উল্লেখ না করলে কর্তব্যচ্যুতি হবে। লোকটি কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসেছিলেন জানি না। কিন্তু সারাজীবন নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো থেকে স্বস্তিকাকে আলোকিত করে গেলেন। যাঁদের নিরলস প্রয়াস ও নিঃস্বার্থ সেবায় শিশু অবস্থা থেকে নিরন্তর বৃদ্ধির ফলে স্বস্তিকা আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে তাঁদের অগ্রবর্তী পথচারী হলেন ভবেন্দুদা। প্রতি সপ্তাহে স্বস্তিকা প্রকাশ করাই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। কোনো সপ্তাহেই তা বন্ধ হয়নি।

ভবেন্দুদার শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্বস্তিকা অফিসে গিয়েছিলাম। আমাদের সময় থেকে কর্মরত বহু পুরাতন কর্মী চিত্ত পাত্র তখন স্বস্তিকা ভাঁজ করছিল। বাস্তবিকই তো, ভবেন্দুদার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলে তো আর স্বস্তিকার প্রকাশ বন্ধ থাকবে না! চিত্ত একগাল হেসে আমার হাতে একটা স্বস্তিকা তুলে দিল। মনটা ভরে গেল।

(লেখক স্বস্তিকার এক আপনজন)

বাংলা জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার ক্রমবিবর্তন ও স্বস্তিকা

অসীম কুমার মিত্র

এই প্রবন্ধের লেখক দীর্ঘদিন ধরে স্বস্তিকার সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত। স্বনামে বেনামে তাঁর বহু রচনাই নানা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি স্বস্তিকার সম্পাদকীয় গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিনিধি।

ইয়োরোপের মত এদেশের জাতীয়তাবাদ কোন প্রতিক্রিয়ার পরিণতি নয়। এদেশের মাটির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ রয়েছে বলেই এখানকার মানুষ জন্মগতভাবেই জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তাবাদই এদেশের মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সমাজের প্রতিটি স্তরেই এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমী ফুলের বাহারের মত এদেশে মাঝে মাঝেই নূতন নূতন আদর্শের আবির্ভাব যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু শিকড় বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারেনি। সীমিতসংখ্যক মানুষ সেই কল্পনার রথে চেপে শূন্য বিহার করলেও বাস্তবের মাটিতে তার পদচারণা ঘটেনি কোনদিন। এদেশের মানুষ এসব আইডিয়াকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেয় নি।

প্রথমেই বলেছি, সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরেই জাতীয়তাবাদের প্রভাব এমনভাবে বিস্তারলাভ করেছিল যার ফলে জাতীয়তাবাদই এখানকার মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাংবাদিকতার অরণ্যযুগেও আমরা এর প্রমাণ পাই। যদিও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা সাংবাদিকতার সূত্রপাত করেছিল শ্রীরামপুরের বিদেশী পাদ্রীরা, নিজেদের প্রয়োজনে– ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। তবু সেই প্রারম্ভিক যুগ থেকেই বাংলা সংবাদপত্র আমাদের দেশের সুপ্ত জাতীয়তাবাদ স্ফুরণের প্রধান বাহন স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পাদ্রী ক্লার্ক মার্শম্যান এবং জিসি মার্শম্যান ১৮১৮ সালের এপ্রিল এবং মে মাসে যথাক্রমে বাংলা মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' এবং 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন। বলা যায় বাংলা সাংবাদিকতার সূত্রপাত এখান থেকেই। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় নামক এদেশীয় দুই ব্যক্তি 'বেঙ্গল গেজেট' নামে ১৮১৮ সালের জুন মাসে যে বাংলা পত্রিকাটি প্রকাশ করেন– প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় জাতীয় চিন্তাধারার পরিপোষক ও উদ্বোধনকারী হিসাবে তার স্থান সর্বজনস্বীকৃত। পত্রিকাটি রাজা রামমোহন রায়ের জাতি গঠনমূলক সংস্কার প্রচেষ্টার সমর্থক ছিল। বেঙ্গল গেজেট পত্রিকার মাধ্যমে–রামমোহনের চিন্তাধারার যে প্রভাব সমাজে বিস্তারলাভ করেছিল তা লক্ষ্য করে রাজা রামমোহনও ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন তাঁর এই সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে সেইসব সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন যাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয়। এবং তাদের অভাব অভিযোগের কথা সরকারের দৃষ্টিগোচর করা যায়। এই পত্রিকাটির সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি ছিল সমগ্র ভারতবর্ষ। ভারতে নিঃশুল্ক শিক্ষা ব্যবস্থা, স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি,চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবসায় প্রবর্তন, সতীদাহ প্রথার-উচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ের উপর সম্বাদ কৌমুদীতে নিমিত সংবাদ ও নিবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় রামমোহন নিয়মিত লিখতেন। অবশ্য পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন ফার্সি সমগ্র ভারতের-আদালতের ও শিক্ষিতজনের ভাষা। তাই রামমোহন তাঁর বক্তব্যকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য ১৮২২ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে মীরাৎ-উল-আখবার নামে একটি ফার্সি পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

বাংলা 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'মীরাৎ-উল-আখবার-এ রামমোহন নানা বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত নির্ভীকভাবে প্রচার করতে লাগলেন। তার উপর আরেক উপসর্গ হল মীরাৎ-উল-আখবারে যে সব ভালো ভালো নিবন্ধ প্রকাশিত হত, সিল্ক বাকিংহামের ক্যালকাটা জার্নালে তার অনুবাদ প্রকাশ করা হত। কারণ সিল্ক বাকিংহাম ছিলেন রামমোহনের বিশেষ বন্ধু। কিন্তু এই রকম স্বাধীন মতামত প্রকাশ সরকারের পক্ষে বেশীদিন বরদাস্ত করা সম্ভব হল না। ১৮২৩ এর ডিসেম্বর মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই মর্মে একটি অর্ডিনান্স জারি করলেন যে, গবর্নর জেনারেলের কাছে লাইসেন্স না নিয়ে কোন সংবাদ এবং সাময়িক পত্র প্রকাশিত হতে পারবে না।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার এ চেষ্টা নতুন নয়। এদেশের প্রথম সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরাজী, ১৭৮০ সালের জানুয়ারী জেম্‌স অগাস্টাস হিকি সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের পর দুবছর যেতে না যেতেই এ কাগজ খানাকে কোম্পানী বন্ধ করে দেয়। কারণ সরকারের মতে হেস্টিংসের স্ত্রী ও পদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য এতে স্থান পেয়েছিল। এরপর ইণ্ডিয়া গেজেট, হরকরা প্রভৃতি আরও কয়েক খানা কাগজ প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এসব কাগজের উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ এসব পত্রিকায় শাসন ব্যবস্থার ও রাজ্যজয়ের গর্হিত উপায়গুলির বিরুদ্ধে

কঠোর সমালোচনা করা হত। সমালোচনার এই কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে।১৭৯৯ সালের মে মাসে লর্ড ওয়েলেসলি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন। নিয়ম হল সরকারের সেক্রেটারী কর্তৃক পরীক্ষিত না হলে কোন সংবাদ এমনকী বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশ করা চলবে না। সতেরো বছর চলার পর ১৮১৮ সালের ১৯শে আগস্ট এ আইন তুলে দেওয়া হল। এর পরিবর্তে অন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হল যা অমান্য করলে সম্পাদকদের জবাবদিহি করতে হত। কিন্তু কোম্পানীর শাসন পদ্ধতিই এমন ছিল যে নিরপেক্ষ সাংবাদিক তা সমালোচনা না করে পারতেন না। হিকির মত ক্যালকাটা জার্নালের সিল্ক বাকিংহামকেও জোর করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অস্থায়ী বড়লাট লর্ড অ্যাডাম ১৮২৩ এর ৪ঠা এপ্রিল আবার এক কড়া প্রেস আইন জারি করলেন। আইনে বলা হল যে, কাগজ বের করার পূর্বে স্বত্বধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হতে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফ করে সেই হলফনামা সরকারের মুখ্যসচিবের কাছে পাঠালে তবে লাইসেন্স পাওয়া যাবে। কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হতেই সম্পাদককে দিয়ে রাখা হত। এসব সত্ত্বেও আইন বিরুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা থাকলে কাগজ বন্ধ করে দেওয়ারও ব্যবস্থা হল।

রামমোহন এরূপ আইন মেনে নিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে রাজী হলেন না। তিনি এর প্রতিবাদে মীরাৎ-উল- আখবার বন্ধ করে দিলেন। 'মীরাৎ' বন্ধ করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। সর্বোচ্চ আদালতে তিনি এই অন্যায় অর্ডিনান্স-এর বিরুদ্ধে আপীল করেন। আপীলটি সেখানে বাতিল হলে তিনি ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে অপীল করেন। এই আপীলে রামমোহনের সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপীলটি লিখেছিলেন রামমোহন নিজে। রামমোহনের জীবনী লেখিকা মিস কলেট রামমোহন রচিত এই আপীলটিকে ভারতের পরাধীনতার প্রতিবাদে প্রথমতম সনদ বলে অভিপিত করেছেন।

উক্ত আপীলের কপি হস্তগত করা গেলেও তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় মীরাৎ-উল-আখবারে প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ রচনায়। ঐ রচনায় তিনি পত্রিকাটি বন্ধ করে দেবার কারণ কি তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

''......এ অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য সমাজে সর্বাপেক্ষা নগন্য হলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে এই—পত্রিকা বন্ধ করলাম। বাধাগুলি এই– ''প্রথমতঃ প্রধান সেক্রেটারীর সঙ্গে যে সব ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দারোয়ান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়ে এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে যাওয়া দুরূহ; এবং আমার বিবেচনায় যা নিষ্প্রয়োজন সে কাজের জন্য নানা জাতীয় কাজে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দুয়ার পার হওয়াও অমার পক্ষে কঠিন। কথায় আছে--যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের কাছে বিক্রী কোরো না।

''দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের সমকক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দাজনক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাছাড়া সংবাদ পত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করতে হবে।

''তৃতীয়তঃ অনুগ্রহ প্রার্থনায় অখ্যাতি ও হলফ করবার অসম্মান ভাজন হবার পরও গবর্নমেন্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হতে পারে– এ আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে অপদস্থ হতে হবে, আর এই কারণে তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হবে। কারণ মানুষ, স্বভাবতঃই সত্য কথা বলতে গিয়ে তাকে হয়তো এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা গবর্নমেন্টের নিকট অপ্রীতিকর হতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌনতা অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করলাম। হাফিজ তুমি কোণ্ ঘেঁষা ভিখারীমাত্র চুপ করে থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানে।'

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রামমোহন ও তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টা তক্ষুনী সফল না হলেও পরবর্তীকালের সরকারকে রামমোহনের যুক্তি মেনে নিতে হয় এবং ঐ কুখ্যাত অর্ডিনান্সও প্রত্যাহার করে নিতে হয়। যাই হোক, ১৮২৩ সালের পর থেকে বেশ কিছুদিন ধরে সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকার মধ্যে লেখনী যুদ্ধ বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র হিসেবে গোঁড়ামী ও কুসংস্কার উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। ওদিকে গোঁড়া হিন্দুদের সংস্থা ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' তথাকথিত প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করতো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আগে সম্বাদ কৌমুদীরই সম্পাদক ছিলেন। ঐ সংবাদপত্র দুটির লেখনী যুদ্ধের ফলে বাংলার জাতীয় জীবনে ধর্ম সম্পর্কে প্রথম সংস্কার মুক্ত চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। রামমোহন হিন্দু ধর্ম বিষয়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সতীদাহের কুসংস্কার যে কিরূপ বীভৎসতার জন্ম দিয়েছে তার প্রমাণ দিতে গিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন যাতে একজন কুলীনের মৃত্যুতে অন্ততঃ ৩৫টি যুবতী স্ত্রীকে চিতায় প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং চারদিন ধরে চিতা জ্বলেছিল। ধর্মের নামে এর চেয়ে নৃশংস ব্যাপার আর কি হতে পারে!

মোট কথা লেখনীর ঐ লড়াই দেশের মানুষকে ভক্তিনিষ্ঠ দেশপ্রেমিকতার আলোক সরণিতে টেনে আনতে অনেকটা সাহায্য করেছিল। এদিকে রাজা রামমোহন যে প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইংলণ্ডের-- প্রিভি কাউন্সিলে পর্যন্ত গিয়েছিলেন-- ১৮৩৫ সালে গভর্নর জেনারেল সার চার্লস মেটকাফ্ তা প্রত্যাহার করে নেন। সাংবাদিকতার সেই প্রাথমিক যুগে এ ছিল এক বিরাট জয়। আবার একবার নূতন নূতন সংবাদ পত্র প্রচলনের হিড়িক পড়ে যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'সংবাদ প্রভাকর'। এই পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য

ছিল অনেক রকমের। ১৮৩১ সালের প্রথমদিকে এটি সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৮৩৬ এর আগস্ট মাসে এটি আবার প্রকাশিত হয় । সংবাদ প্রভাকর তখন সপ্তাহে তিন দিন বের হত। এরপরেই ১৮৩৯ থেকে পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক। একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন বলেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী মুখে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন কল্পে অনর্গল হৃদয়গ্রাহী বাণী নির্গত হতে থাকে। সংবাদ প্রভাকরের সংখ্যাগুলি খুলে বসলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রেমের উৎস ছিল ভারত। স্বদেশ বলতে তিনি ভারতবর্ষই বুঝতেন। এখানে বেশী উদ্ধৃতি দেবার অবকাশ নেই। তবু সংবাদ প্রভাকরের পাতায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা থেকে কিছুটা এখানে উল্লেখ করছি :

স্বস্তিকার সম্পাদকীয় দপ্তর— একটি বিশেষ মুহূর্ত।

প্রভাকরের সংখ্যাগুলি খুলে বসলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ প্রেমের উৎস ছিল ভারত স্বদেশ বলতে তিনি ভারতবর্ষই বুঝতেন। এখানে বেশী উদ্ধৃতি দেবার অবকাশ নেই। তবু সংবাদ প্রভাকরের পাতায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা থেকে কিছুটা এখানে উল্লেখ করছিঃ-

“জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানাহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে।
ভ্রাতৃভাব-ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।”

সংবাদ প্রভাকরের পর জাতীয়তাবাদ উন্মেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকা। ১৮৫৩ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নাট্যকার নন) এই পত্রিকাটি শুরু করেন এবং ১৮৫৫ সালে শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক হন। তাঁর সম্পাদনায় বাংলা সাংবাদিকতায় এক নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীর আবির্ভাব ঘটে– আর তা হল কেবলমাত্র অন্যায় অবিচারের কথা বলেই ক্ষান্ত হওয়া নয়-এসবের প্রতিকার করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হবার আহ্বানও–শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানাতে থাকেন। নীলকর চাষীদের দুঃখ দুর্দশার এমন এক সাংঘাতিক চিত্র তিনি হিন্দু প্যাট্রিয়টে তুলে ধরেন যার ফলে সরকার তদন্ত কমিশন নিয়োগে বাধ্য হন।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালে হরিশচন্দ্রের লেখনী মুখে যে আগুন বেরোতে থাকে তার তপ্ততা বৃটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তুললেও তাদের করার কিছুই ছিল না। হরিশের চিন্তায় ভারতবর্ষ ছিল অখণ্ড একটি দেশ, ভারতবাসী একটি মহাজাতি। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে লর্ড ক্যানিং সারা ভারতে যে প্রতিশোধমূলক দমননীতির তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিলেন তা তাকে সংযত করতে হয় হরিশচন্দ্রের লেখার জন্য। সেই সময়–বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্ন ওঠে যে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। নির্ভীক হরিশচন্দ্র হিন্দু প্যাট্রিয়টে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, “ভারতবর্ষ কে শাসন করবে, তা আর বেশীদিন বৃটিশ পার্লামেন্টকে ভাবতে হবে না। ভারতবাসীরাই তা স্থির করবে, সেই দিনের সূচনা দেখা দিয়েছে।”

সেদিনকার সেই সামাজিক পরিবেশে হরিশচন্দ্রের এই বীরত্ব ব্যঞ্জক ভূমিকা সকলকে সচকিত করে তুলেছিল। কিন্তু সংগ্রাম অসম্পূর্ণ রেখেই হরিশচন্দ্র অকালে পরলোক গমন করলে হিন্দু প্যাট্রিয়টের জীবনকালও শেষ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় মুমূর্ষু হিন্দু প্যাট্রিয়ট আবার বেঁচে ওঠে। প্যাট্রিয়টের পরবর্তী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল হরিশচন্দ্রের মত অতটা উগ্রপন্থী (আধুনিক পরিভাষায় চরমপন্থী) না হলেও ১৮৭৪ সালেই স্বায়ত্তশাসন লাভের সমীচীনতা ব্যাখ্যা করে হিন্দু প্যাট্রিয়টে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। নিশ্চয়ই স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রায় ৫০ বছর পরে কংগ্রেস এই দাবীরই ভিত্তি হোমরুল আন্দোলন করে।

এই সময়ে ছোটখাট আরও বেশ কিছু পত্র পত্রিকা বাজারে ছিল। প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই তখন জাতীয়তাবাদ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের মন্ত্র উচ্চারিত হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘সোম প্রকাশ’ কিম্বা বাংলা, হিন্দী ভাষায় একযোগে প্রকাশিত সংবাদ সুধাকর অথবা ইয়ং বেঙ্গলের ইংরাজী পত্রিকা ‘সমাচার হিন্দুস্থান’, ও হিন্দী ‘ভারত পত্রিকা’ এবং মনমোহন ঘোষ সম্পাদিত ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ প্রভৃতি সকলেরই আদর্শ জাতীয়তাবাদে গাঁথা ছিল। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন ‘সুলভ সমাচার’ একটি এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। সারা ভারতের খবর ও আলোচনা এতে স্থান পেত। ভারত প্রাণ মনীষী কেশবচন্দ্র সেন ভারতের অধিবাসী মাত্রেরই কল্যাণ কামনা করেছেন তাঁর পত্রিকার ছত্রে ছত্রে। তাঁর কর্মস্থলও ছিল সারা ভারত। ইণ্ডিয়ান মিরর ও সুলভ সমাচার–পত্রিকা দুটির বিশেষ

উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ঐক্য গঠন ও তার উন্নতিতে সহায়ক হয় এমন সংবাদ প্রকাশ করা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতামহরূপে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ঠাকুর পরিবারের যুবকবৃন্দ, কবি ও নাট্যকার মনোহেন বসু প্রভৃতির সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে 'হিন্দুমেলা' নামে একটি জাতীয় উৎসবের প্রবর্তন করেন। তখনও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়নি। হিন্দুমেলা জাতীয় জাগরণের বেদীমূল হিসাবে চিহ্নিত হয়। হিন্দুমেলার সঙ্গে যুক্ত মনোমোহন বসুর 'মধ্যস্থ' নামক পত্রিকাও ভারতীয় জাতির ঐক্য ও জাতীয়তা প্রচারে ব্রতী হয়। হিন্দু প্যাট্রিয়ট যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিন 'বেঙ্গলী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। নামে বেঙ্গলী হলেও এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সর্বভারতীয় এবং ভারতের জাতীয়তাবোধ উন্মেষে এরও অবদান ছিল যথেষ্ট। ১৮৬৮ সালে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা শুরু করেন। প্রথমে বাংলা সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয় এবং বছর খানেক পর ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এর প্রকাশ হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে অমৃতবাজারের অবদান ছিল চিরস্মরণীয়। ১৮৭৮ সালে ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্তন করলে শিশির কুমার প্রায় রাতারাতি এটিকে সম্পূর্ণ রূপে ইংরাজী পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন। ১৮৯১ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। শিশির কুমারের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও চেতনা এত উঁচু স্তরের ছিল যে, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁকে রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীকার করতেন। সর্বভারতের ঐক্য সাধনায় এবং দেশপ্রেম প্রচারে অমৃতবাজারের অবদানের কথা তিলক প্রভৃতি সকলেরই স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয় এক সময় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে ঋষি বঙ্কিমের অবদান চিরস্মরণীয়। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা হিসাবে তো বটেই ভারতীয় জাতীয়তাবোধের একজন শক্তিশালী ঘোষক হিসাবেও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান সর্বজন স্বীকৃত। দেশভক্তি ও ভারতীয় মহাজাতি গঠনের জন্য রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের প্রয়াসকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র অভিনন্দিত করেন। মারাঠা ও শিখশক্তি মোগল ও বৃটিশের যে দুর্দশা এনে দিয়েছিল তার আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন, '' যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এত দূর ঘটিয়াছিল তবে সমুদয় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত''(বঙ্গদর্শন, বৈশাখ,১২৭৯)। স্বদেশপ্রেমকে বঙ্কিম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করতেন। ঋষি বঙ্কিমের সমসাময়িক কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট' নামক একটি পত্রিকায় ''স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'' প্রবন্ধটি ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেব কল্পনা করেন যে ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং '' আজি ভারতভূমি মাতৃভূমিপরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিয়া ইহাকে শান্তি জলে অভিসিক্ত করিবেন।'' এই প্রবন্ধেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কবি হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি প্রকাশের জন্য এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হিসাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে আদালতে গিয়ে তার জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বঙ্গবাসী (১৮৮১), সঞ্জীবনী (১৮৮২), হিতবাদী (১৮৯১), বসুমতী (১৮৯৬) প্রভৃতি কয়েকটি শক্তিশালী বাংলা সাপ্তাহিকের জন্ম হয়। জাতীয় ঐক্য গঠনে এবং দেশাত্মবোধ জাগরণে জাতীয় ইতিহাসে এই পত্রিকাগুলি গৌরবাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত সঞ্জীবনী পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে ভোলানাথ চন্দ নামে এক ভদ্রলোক বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথা (বা বয়কটের কথা) সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন। বিংশ শতাব্দীতে সঞ্জীবনীই প্রথম বিদেশী দ্রব্য বর্জনের পরামর্শ দেয়। সঞ্জীবনীর এই প্রস্তাবটি প্রকাশের কয়দিন পরেই স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক এটা গৃহীত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে জগদ্‌পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' শুরু করেন। পরে বাংলা মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'ও প্রকাশিত হয়। জাতীয় চরিত্র গঠন, জাতীয় চেতনা ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি কাজে পত্রিকা দুটির অবদান অনস্বীকার্য। এই 'উদ্বোধন' পত্রিকাতেই স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, ''হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল ভারতবাসী আমার ভাই, বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ....''।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কালে যে পত্রিকাটি জনমনে ও স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার নাম 'সন্ধ্যা'। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই বাংলা দৈনিকটি শুরু করেছিলেন। তিনি যে কোন উপায়ে বৃটিশ শাসনের পতন ঘটানর জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯০৫ সালেই ভূপেন দত্ত ও বারীন ঘোষের সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' ও ১৯০৬ সালে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবাসীকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণা দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথও ১৯০১ সালে নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক রূপে জাতিকে আত্মনিবেদনের পথ ত্যাগ করে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে এবং আত্মনির্ভর হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনেই রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' নামক কবিতায় লিখেছিলেন, ''আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব দক্ষিণ ও বামে, একত্রে করুক ভোগ একটি গৌরব , এক পুণ্য নামে।''

শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে বাংলায় এসে ১৯০৬ সালে ইংরাজী বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক রূপে আপামর দেশবাসীকে বিপ্লবের অভীমন্ত্রে দীক্ষিত করতে থাকেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের যুগ বলা যায়। এই সময়

বাঙলাদেশের প্রতিটি সংবাদপত্রই যেভাবে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করেছিল তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা সাংবাদিকতার সে ছিল স্বর্ণযুগ। এই সমসাময়িক কালে যে পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তাদেরও জাতীয়তাবাদী ভূমিকা অবিসম্বাদিত। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'সারভেন্ট', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা দৈনিক 'নায়ক', দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড', 'আত্মশক্তি' 'বাঙলার কথা' প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেযোগ্য। মাখন সেন ভারত নামে একটি দৈনিক পত্রিকা শুরু করনে। ১৯২২-এ প্রফুল্ল সরকার ও বাঘা যতীনের সহকর্মী সুরেশ মজুমদার অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার ও দেশ সেবার উদ্দেশ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রবর্তন করেন।

সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করলে বাংলার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের কথা সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর বাংলা মাসিক 'প্রবাল' ও ইংরাজী মাসিক 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার অবদান জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। সেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগ থেকেই সাময়িক পত্রিকাগুলি এই ভূমিকা বজায় রেখেছিল। এছাড়া আরও অনেক সাময়িক পত্র আছে যাদের সকলের নাম উল্লেখ স্থানাভাববশতঃ করছি না। কিন্তু সাংবাদিকতার সেই অরণ্যযুগ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাংবাদিকতার সুর ছিল জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী— প্রথমে জাতীয়তাবোধ জাগরণ, দেশপ্রেমের উদ্বোধন, তারপর ধীরে ধীরে ভারতমায়ের পরাধীনতা মোচনের সম্পূর্ণ যুবশক্তিকে আন্দোলনের পথে নামানোর কাজে উৎসাহ দান এবং বিদেশী রাজশক্তিকে দেশের নবজাগ্রত জনমানস সম্পর্কে অবহিতকরণ সবই সাংবাদিকতার মাধ্যমে হয়েছিল। কাজেই বাংলা সাংবাদিকতা ও জাতীয়তাবাদী সাংবাদাতিকতার মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। সে ভেদ বা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে যখন রাতারাতি সকলে দেশের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে সুখভোগের জন্য লালায়িত হয়ে পড়লেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সাংবাদিকতায় যে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ঢুকে গেল তার ফলে তার স্বকীয়ত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছুই রইল না।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সংবাদপত্র জগতের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রথমেই বলেছি,রাতারাতি বেশিরভাগ পত্রিকাই ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কাগজ চালানো বা না চালানো, আদর্শবাদী পথে চলা বা না চলা, কিম্বা চটুল, সস্তা ও বিকৃত রুচির সংবাদ পরিবেশন করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথমদিন থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দের জীবন থেকে যেমন ত্যাগ, তিতিক্ষা, দেশ সেবার তন্ময়তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ভোগ লালসার হীন ও বিকৃত রুচি, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। বাঙলাদেশের সাংবাদিকতার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের যে অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল তা এমন আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন শুধু নয়, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যে, পুরনো দিনের মানুষ কিম্বা পুরনো কথা সম্পর্কে অবহিত মানুষ সাংবাদিকতার চরিত্রের এই আমূল পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

একদিন যখন এই বাঙলাদেশের সাংবাদিকরা ভোগ লালসা তো দূরের কথা, জীবনের জন্যও কিঞ্চিৎমাত্র মায়া না করে সাংবাদিকতার তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আদর্শবাদী ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে সমুদ্র পারের সুনিশ্চিত স্বপ্ন দেখতেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁরা এমন পাল্টে গেলেন কেন? জাতির সামনে এবং জাতির কর্ণধারদের সামনে এ এক বিরাট প্রশ্ন। এর কোন সদুত্তর আছে কি না জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে ধৈর্য্য, সাহস, বীরত্ব ও কর্মদক্ষতা প্রয়োজন, দেশ গঠনের কাজে ঐ সব গুণগুলিই আরও অনেক বেশী পরিমাণে থাকা দরকার। অথচ সেসব কিছু না হয়ে হল ঠিক এর উল্টো ব্যাপার। মনে হয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাংবাদিকতায় কিঞ্চিদধিক পরিমাণে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারত সম্পর্কে একটা আবছা কল্পনা থাকলেও জাতীয় নেতৃবৃন্দের সামনে তেমন কোন সুস্পষ্ট বা আবছা চিত্রও ছিল না। তাই ভূদেব মুখোপাধ্যায় এডুকেশন গেজেটে তাঁর '' স্বপ্নের স্বাধীন ভারতের'' একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তেমন কোন কথা বলেন নি। সম্ভবতঃ তাঁরা সকলেই ভেবেছিলেন, আগে স্বাধীনতা আসুক, বৃটিশ হটে যাক, তাহলেই পরের সমস্যাগুলিকে আপনা হতে বা সহজেই সমাধান করা যাবে। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বা রাষ্ট্রনায়কদের মনে এই অনিশ্চিয়তা থাকার দরুনই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছর পরেও দেশের সর্বক্ষেত্রে আজ হতাশা ও হতভম্বতা রয়েছে। এ থেকে উত্তরণের কোন পথনির্দেশ কোন মহল থেকেই আসছে না। তাই সাংবাদিকতায় আজ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ে কালোবাজারী করার অপচেষ্টা চলেছে। দেশের বর্তমান হতভম্বতা ও হতাশার মাঝে আশার অনির্বাণ শিখা তুলতে পারত যে সাংবাদিকতা তা আজ অনুপস্থিত। যে অমৃতবাজার বা আনন্দবাজার পত্রিকা দেশসেবার আদর্শ প্রচার ও দেশাত্মবোধ উদ্বোধন করার জন্য শুরু হয়েছিল আজ তারা সেই চরিত্র হারিয়ে বসেছে— বারবনিতা সুলভ আচরণ আজ তাদের অতীত গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। এর বহু প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে।

বাংলা সাংবাদিকতা আজ দুটি খাতে বইছে। এক, পার্টিগত প্রচার। দুই, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিকৃত রুচির আইডিয়া প্রচার। এর মধ্যে বাদ যে চিন্তা— তার নাম হল দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের বোধ। যত ক্ষুদ্র শক্তিই হোক না কেন সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' এই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিয়ে গত ২৫ বছর অবিমিশ্রভাবে তা পালন করে এসেছে। এই সময়ে বহু পত্রিকা উঠেছে – ডুবে গেছে। 'স্বস্তিকা' জাতীয়তাবাদের উন্মেষের আদর্শ নিয়ে শুরু হয়েছিল, সেই আদর্শ আজও শুধু বাঁচিয়েই রাখে নি, তাকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার মর্যাদা বৃদ্ধির কাজে 'স্বস্তিকার' অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। স্বস্তিকার পক্ষে এটি কম কথার নয়। □

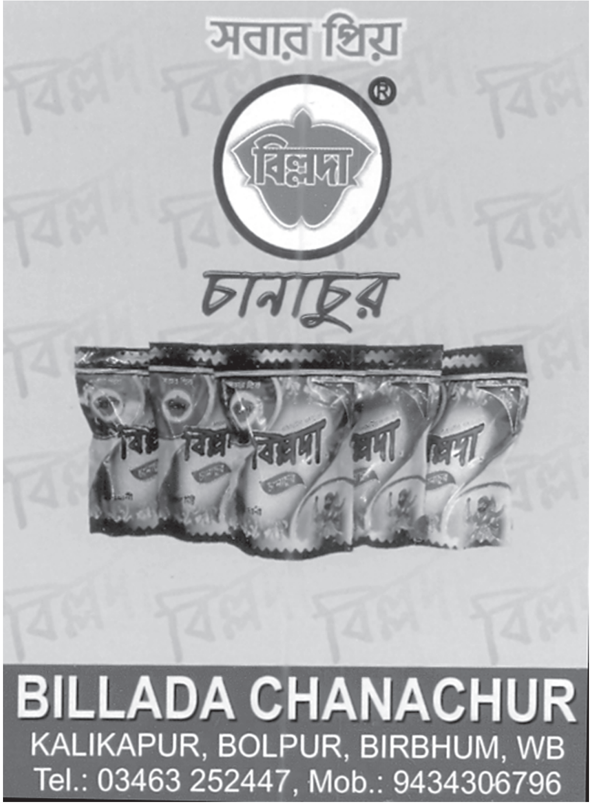

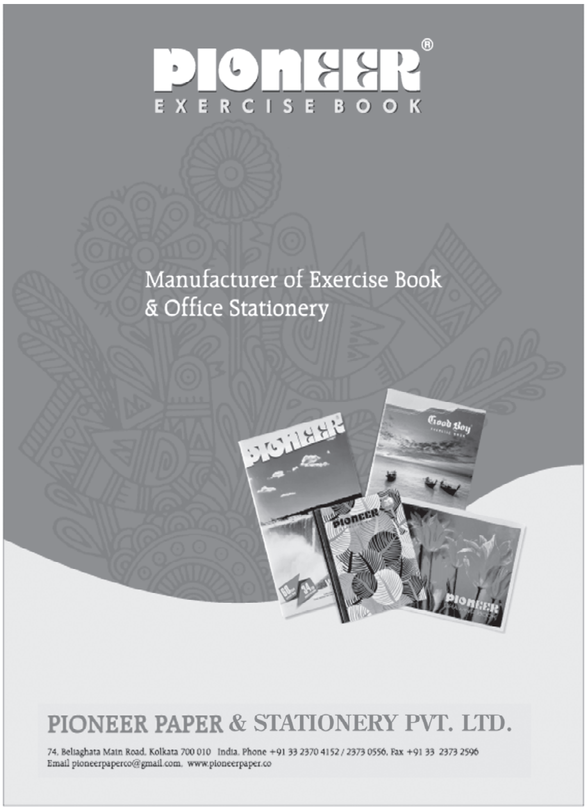

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

হাসিনা সরকার গদি বাঁচাতে হিন্দুদের ব্যবহার করছে

শিতাংশু গুহ

ডারউইন বলেছেন, 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট'— বাঁচার জন্যে যা কিছু দরকার তাই করতে হয়, এটি প্রকৃতির নিয়ম। বাংলাদেশের হিন্দুদের বলি, যাঁরা আপনাকে মারতে আসে, তাঁরা জানোয়ার; জানোয়ারের সঙ্গে জানোয়ারের ভাষায় কথা বলতে হয়! বাঁচতে হলে কান্নাকাটিতে কাজ হবে না, রিলিফ খেয়ে পেট ভরে না, নিউটনের সূত্রমতে, প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সম-পরিমাণ বিপরীত ক্রিয়া থাকে, হিন্দুদের ক্ষেত্রে নিউটন ফেল! জীবন ও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম বাঁচাতে, সহায়-সম্পত্তি রক্ষায় আর নয় প্রতিবাদ, এবার প্রতিরোধ গড়ুন, লড়াই করে বাঁচতে শিখুন। যৌবনে আমরা স্লোগান দিতাম, 'লড়াই লড়াই, লড়াই চাই; লড়াই করে বাঁচতে চাই'। লড়াই করেই বাঁচতে হবে, না পারলে বাংলাদেশ ত্যাগ করুন, ভারত চলে যান।

স্বাধীনতার পর অনেকেই বলতেন, 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মিথ্যা হয়ে গেছে। এখন দেখা যায়, তা তো হয়ইনি বরং জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব বাংলাদেশে নগ্নভাবে প্রকাশিত। ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ লাহোর প্রস্তাবে মহম্মদ আলি জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিল, 'হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়'। বাংলাদেশের হিন্দুরা হয়তো এখন ভাবছে, মুসলমানদের সঙ্গে কি আদতেই থাকা যাবে? যে কোনো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বা মদিনা সনদের দেশে কি আদৌ সংখ্যালঘুরা টিকতে পারে? মদিনা সনদের মদিনায় তো 'অমুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ', তাই না? বিশ্বের ৫০-এর অধিক মুসলমান দেশে সংখ্যালঘুরা কি ভালো আছে? স্বাধীনতার পর সবাই ভেবেছিল বাঙ্গালি জাতীয়তায় উজ্জীবিত বাঙ্গালি হিন্দু-মুসলমান হয়তো একত্রে থাকতে পারবে। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে এখন কি তা মনে হয়? 'হিন্দু বাংলা ছাড়ো' এতো সবার মনের কথা! স্বাধীনতার পর এক কোটি হিন্দু দেশে ফিরে এসেছে, এটি অনেকে মেনে নিতে পারেননি, যদিও না মেনে তখন উপায় ছিল না।

অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী বলেছেন, শুক্রবারটা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। দেশের বুদ্ধিজীবীরা এখনো মোহাবিষ্ট, তন্দ্রাচ্ছন্ন, তোষামোদিতে ব্যস্ত, তাঁরা বুঝতে চাচ্ছেন না যে, শুধু শুক্রবার নয়, পুরো দেশটা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। হিন্দুর কাছে শুক্রবার একটি আতঙ্কের দিন। মিডিয়া লিখছে, নড়াইলের হিন্দুরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। শুধু নড়াইল নয়, পুরো বাংলাদেশের হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত। কেউ জানে না, শান্তিবাহিনী কখন এসে কার ওপর আক্রমণ চালাবে। প্রশাসনের মদত ব্যতীত সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটে না। গত দশ বছরে একের পর এক সন্ত্রাসী আক্রমণ এবং একটি ঘটনারও বিচার না হওয়া এর প্রমাণ। এ যাবৎ ঘটে যাওয়া প্রায় প্রতিটি ঘটনায় আওয়ামি লিগ নেতাকর্মী জড়িত, মিডিয়া জানাচ্ছে, নড়াইলের ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। হিন্দুদের খেদানোর ব্যাপারে আওয়ামি লিগ-বিএনপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ; কথাটা সর্বাংশে সত্য।

২০০১-র পর বিএনপি আমলে হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল, গত এক যুগে আওয়ামি লিগের শাসনকালে সেই রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে পুলিশ দুর্বৃত্তকে না

ধরে ভিকটিমকে ধরে। নড়াইলের ঘটনায় পুলিশ ভিকটিম আকাশ সাহা ও তার বাবাকে সর্বাগ্রে ধরেছে। সন্ত্রাসীরা তাদের ভাই, তাই প্রথমে ধরেনি। মিটিং-মিছিল শুরু হলে পাঁচজনকে ধরে, 'আইওয়াশ'? দেশে এখন একটি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী সুপরিকল্পিত ভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। লক্ষ্য ভয়ভীতির সৃষ্টি করে এদের দেশত্যাগে বাধ্য করা। এই 'বিশেষ ধর্মান্ধ গোষ্ঠী' তৈরির দায় আওয়ামি লিগের। আওয়ামি লিগ জঙ্গিবাদ দমন করেছে, সর্বহারা বা নকশালিদের নিশ্চিহ্ন করেছে, সরকার চাইলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। সরকার তা করছে না, বরং ক্ষমতায় থাকার জন্যে হিন্দুদের জিম্মি করে 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি ব্যুমেরাং হতে বাধ্য। □

ফঃ ৬

নবাঙ্কুর

স্বাবলম্বন ও সমৃদ্ধি

ছোটো বন্ধুরা, একটি কথা মনে রেখো, স্বাবলম্বী না হলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। স্বাবলম্বন মানে নিজের কাজ নিজে করা। কারও উপর নির্ভরশীল না হওয়া। যাঁরা স্বাবলম্বনের দ্বারা জীবনকে তৈরি করেন, ঈশ্বরও তাঁদের প্রতিটি কাজে সহায়তা করেন। তাই ইংরেজিতে একটি কথা আছে , God helps them who helps themselves.

ছোট্ট বন্ধুরা, স্বাবলম্বনের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তির সম্যক বিকাশ সাধিত হয়। ছাত্রজীবনে যদি প্রতিটি বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা যায়, তবে পরবর্তী জীবনে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আত্মনির্ভরতাই সুখ আর পরনির্ভরতাই দুঃখ। অন্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হলে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। স্বাবলম্বন বহু ব্যক্তিকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সাহায্য করেছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। স্যার আশুতোষ প্রতিদিন নিজের জুতোয় নিজেই কালি করতেন। সে কথা একদিন তাঁর বড়ো সাহেব চিফ জাস্টিসের কানে গেল। তিনি বললেন, শুনলাম আপনি নাকি নিজের জুতো নিজেই পালিশ করেন? আশুতোষ খুব রসিক লোক ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, আপনি কার জুতো পালিশ করেন স্যার?

স্যার আশুতোষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাবলম্বন অনুশীলন করে একদিন উন্নতির চরম শিখরে উঠতে পেরেছিলেন। শুধু আশুতোষ কেন, বহু স্মরণীয় ব্যক্তি জীবনে স্বাবলম্বনের ফলে বড়ো হয়েছেন। স্বাবলম্বন জীবনে আত্মবিশ্বাস ও কল্যাণকারী শক্তি উৎপন্ন করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, যে পরের মুখাপেক্ষী থাকে, তার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ স্বাবলম্বন বিষয়ে বলেছেন, পরের অনুগৃহীত হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে মনুষ্য জন্মের কোনো সার্থকতাই নেই।

ছোট্টো বন্ধুরা, ছোটোবেলার সময়টাই হলো স্বাবলম্বন অনুশীলনের উৎকৃষ্ট সময়। শৈশবকাল ও ছাত্রজীবনে যদি তোমরা প্রতিটি বিষয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য নিজেদের যত্নবান করে তোল তবে পরবর্তী জীবনে আর পরের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না।

তাই, তোমরা যত ছোটোবেলা থেকে নিজের কাজ নিজের হাতে করতে শিখবে, তত তাড়াতাড়ি তোমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিজের কাজ বলতে নিজের জামাকাপড় কাচতে শেখা, নিজের পড়ার টেবিলের বইপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজের বিছানা নিজে করতে শেখা। হাট বাজার করতে শেখা। বাড়ির টুকটাক কাজ করা ইত্যাদি। মনে রেখো, স্বাবলম্বী হলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। যারা স্বাবলম্বী তারা নিজের জীবনে সমৃদ্ধি রচনা করে। নিজের জীবনের উন্নতির মূল কথাই হলো স্বাবলম্বন।

@বিচিত্রা

ভারতের বিপ্লবী

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ১৯০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক হন। সাহিত্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় 'অভ্যুদয়' নৃত্যনাট্য সেসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি নদীয়ার সাহেবনগর কৃষিখামারেও কিছুদিন কাজ করেন। গান্ধীবাদী শচীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্য শান্তিমিছিল বের করেন। মিছিলে গুন্ডার ছুরিকাঘাতে ১৯৪৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের থিম হলো 'নেশন ফার্স্ট, অলয়েজ ফার্স্ট'।
- প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সানাই বাজিয়েছিলেন বিসমিল্লা খান।
- স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী পুরনো দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
- ভারতের জাতীয় পতাকায় অশোকচক্রটি নীল রঙের।
- জাতীয় পতাকা কোনো স্থানের সবচেয়ে উঁচু স্থানে স্থাপন করতে হয়।
- জাতীয় পতাকার নকশা করেন পিঙ্গালি বেঙ্কাইয়া।

ভালো কথা

অন্যভাবে রাখিবন্ধন

এবার রাখির দিন আমরা পাঁচ বন্ধু— আমি, ঈশাণী, রিয়া, পল্লবী ও সুদেষ্ণা একটু সকাল সকাল স্কুলের জন্য বেরিয়ে পড়ি। যাবার পথে প্রথমেই জমাদার কাকুদের, তারপর তিনজন জুতো সেলাই কাকুকে, তিনজন সেলুন কাকুকে, পাঁচজন ভ্যানকাকুকে রাখি বাঁধতে বাঁধতে স্কুলে পৌঁছাই। স্কুলে প্রথমে দারোয়ান কাকুকে বেঁধে, দপ্তরিকাকুকে বেঁধে ক্লাসের বন্ধুদের বাঁধি। পরে হেডস্যারের ঘরে গিয়ে স্যারকে বাঁধি। ক্লাস নিতে আসা সব টিচারকে বাঁধি। স্কুল থেকে ফেরার পথে আবার রাস্তার ধারের দোকানদার কাকুদের বাঁধতে বাঁধতে বাড়ি ফিরি। আমরা অগেই ঠিক করেছিলাম এবারের রাখিবন্ধন আমরা একটু অন্যভাবে পালন করব।

যাজ্ঞসেনী রায় , একাদশশ্রেণী, নডিহা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) খি ন্ধ রা ব

(২) ট মু রা কু

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন শি ক প্র ক্ষ

(২) ন দ ম প্র র্শ

১১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) চন্দ্রমল্লিকা (২) ছাদনাতলা

১১ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) হাজারদুয়ারি (২) পণ্ডিতমশাই

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, সেকেন্দারপুর, অমৃতি, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯
(৩) অভিজিৎ দাঁ, টিপি রোড, কল-৬। (৪) অর্কিড ভট্টাচার্য, বসন্তপুর, সুলতানপুর, পঃ মেদিনীপুর

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

স্বস্তিকার প্রথম আবির্ভাব কাহিনী

ভৈরব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এই প্রবন্ধের লেখক স্বস্তিকার অন্যতম প্রাক্তন সম্পাদক। স্বস্তিকার জন্মকাল থেকেই তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জীবিকার অন্বেষণে তাঁকে দূরে থাকতে হয়েছে। কিন্তু স্বস্তিকার সম্পর্কে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

স্বস্তিকা'র কর্তৃপক্ষ আদেশ করেছেন পত্রিকার আদিকালের কিছু কথা লিখতে হবে। একালের স্বস্তিকা জীবনের পঁচিশটি বসন্ত অতিক্রম করে পরিপূর্ণ যৌবনে উপনীত। একালের পরিচালকরা সেকালের দারিদ্র্য ক্লিষ্ট ক্ষীণ শিশু স্বস্তিকার জন্মকালের ইতিহাস পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু যে কাহিনী সে কালে ছিল করুণ, সময়ের ব্যবধানে সে হয়ত এ কালের পাঠকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

স্বস্তিকা প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে উদ্যোগী হিসাবে প্রধানতঃ চার জনের নাম উল্লেখযোগ্য। একজন বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র নাথ পণ্ডিত, দ্বিতীয় জন একালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট এবং শ্রমিক নেতা শ্রীনরেশ গাঙ্গুলী, তৃতীয় ব্যক্তি কাষ্ঠ ব্যবসায়ী শ্রীরবীন্দ্র নাথ হোড় এবং চার নম্বরে বর্তমান লেখক। এদের মধ্যে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ নরেশ গাঙ্গুলী এখনও স্বস্তিকার প্রকাশনার সঙ্গে কোন না কোন প্রকারে যুক্ত আছেন। অপর সকলকেই জীবিকার অন্বেষণে ঐ পরিমণ্ডল থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছে। তবে জীবিত আছেন সকলেই এবং বেশ সুস্থ দেহেই আছেন।

স্বস্তিকা প্রকাশের সময়ে এই চার জনের মধ্যে হেমেনদা বেকার। যে সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সেটির আকস্মিক পঞ্চত্ব প্রাপ্তির ফলে এই দুরবস্থা অথচ নিজে অকৃতদার হলেও একটি বৃহৎ সংসারের দায়িত্বের বড় অংশটাই তাঁকে বহন করতে হয়। নরেশ গাঙ্গুলী এবং রবীন হোড় নিজের নিজের বাবার হোটেলে খায়। এদের মধ্যে একজনের পিতার হোটেলটির অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়। তাই পারিবারিক কর্তব্য পালনের জন্য তাঁকে একটা চাকুরি করতে হয় বিএন রেলের অফিসের কেরাণী পদে। বেতন সাকুল্যে মাত্র নিরানব্বই টাকা। রবীন হোড় পারিবারিক ফার্নিচারের দোকানে মাঝে মাঝে বসে। তার ফলে খোরাক পোষাকের খরচ ছাড়াও মাসে হাত খরচ পায় চল্লিশ টাকা। আমাদের মধ্যে সে-ই স্বচ্ছল। ট্রামে বাসে ইচ্ছামতো চড়তে পারে। রেস্টুরেন্টে চা খেতে এবং খাওয়াতে পারে। চতুর্থ ব্যক্তি পূর্ববঙ্গের রিফিউজি। প্রকৃতই ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। হেমেনদার বয়স তখন বিশের কোঠার মাঝামাঝি। নরেশ বিশের কোঠা ছুঁয়েছে আর অপর দুজন যোড়শ বর্ষ প্রাপ্ত হয়ে আরও বছর দুয়েক এগিয়েছি।

কাগজ চালাবার বা কোন বৈষয়িক ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও একথা গোড়া থেকেই না বোঝা কষ্টকর ছিল না যে এ ব্যাপারে সবচেয়ে আগে দরকার কিছু টাকার। অন্ততঃ হাজার চারেক। আমাদের সবার সঙ্গেই জাতীয়তাবাদী সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অনেক টাকা ও অনেক খ্যাতির অধিকারী বেশ কিছু ভারী ওজনের মানুষের সঙ্গে দেখা করে অনেক উপদেশ, অনেক উৎসাহ লাভ করলেও চারহাজার টাকা দূরে থাক চারটি টাকাও সংগ্রহ করবার যোগ্যতা দেখাতে পারা গেল না। অগত্যা ঠিক হ'লো আর পরের মুখাপেক্ষী নয়। এবার সম্পূর্ণ নিজেদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই কাগজ বের করতে হবে।

কিন্তু কেন এই আগ্রহ? কেন এই সংকল্প? দেশে ত' ছোট বড় পত্রিকার অভাব ছিল না। অভাব সত্যই ছিল না। কিন্তু আমাদের মনের মত কাগজ বাংলা ভাষায় একটিও ছিল না। ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই দেশে সাংবাদিকতার এক নূতন যুগের সূচনা হয়। ঘটে যা তা সব সত্য নয়। তাই ঘটনা যে ভাবে ঘটেছে ঠিক সে ভাবে সে সংবাদ পরিবেশন না করে যে ভাবে ঘটলে কর্ত্তাদের সুবিধা হত সেভাবে তার নূতন চেহারা দেওয়া, ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বেমালুম চেপে যাওয়া এবং সাংবাদিকের টেবিলে বসে খবর তৈরির ঐতিহ্যের শুরু তখন থেকেই। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রেরও সংবাদ বিকৃত করবার স্বাধীনতার নবযুগ এসে যায়। স্বাধীনতার ছয় মাসের মাথায় গান্ধীজীর হত্যার ঘটনায় সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতার চরম প্রকাশ দেখা যায়। যাদের সঙ্গে ঐ ঘটনার কোনই যোগসূত্র ছিল না তাদের উপরই সমস্ত অপরাধের দায় চাপিয়ে দেওয়ার সুসংহত প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায় এবং জনমতও তার ফলে প্রভাবিত হতে থাকে। দেশপ্রেমভিত্তিক যে জাতীয়তাবাদের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল দেশের কর্ত্তা ব্যক্তিদের তার প্রতি বিরাগের ফলে কোন পত্র পত্রিকায় আমরা আমাদের চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি খুঁজে পেতাম না। তাই আমরা সংকল্প করেছিলাম এমন একখানা পত্রিকা বের করতে হবে যাতে বড় বড় কাগজের এই সব চেপে যাওয়া খবর অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করা হবে। আমাদের মতামত আমরা খোলাখুলি ভাবে সম্পাদকীয়তে তুলে ধরব। কিন্তু সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিকতার পবিত্র আদর্শ থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত হব না। সংবাদকে বিকৃত করব না কিছুতেই।

পত্রিকা প্রকাশের আগে আমরা আরও সংকল্প নিয়েছিলাম যে আমরা কোন দলের মুখপত্র হিসাবে কাজ করব না, নিরপেক্ষ ভাবে সব দলের ভাল মন্দ কাজের নিন্দা প্রশংসা করব। খবরের কাগজ রাজনীতি বর্জিত হতে পারে না। তবে রাজনীতি আমাদের ধ্যান জ্ঞান হবে না। রাজনীতির বাইরে অন্য অন্য বিষয়ের মধ্যে হিন্দু সংগঠনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন

জানাব। হিন্দু সমাজকে নানাবিধ কুসংস্কারের বাঁধন থেকে মুক্ত করে একটি আধুনিক, বলবান, জীবন্ত ও সৎ মনুষ্য সমাজে রূপান্তরিত করার কাজে যে যেখানে ব্রতী হয়েছে তাদের সবার প্রতি থাকবে আমাদের দৃঢ় সমর্থন।

আরও স্থির করেছিলাম যে কাগজের বহিরঙ্গ হবে আকর্ষণীয়, ভাষা হবে স্বচ্ছ ও সাবলীল, প্রতি সংখ্যার বিষয়বস্তুতে এমন বৈচিত্র্য রাখতে হবে যার ফলে পাঠকেরা প্রতি সংখ্যার কাগজের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। কাগজে বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না। প্রতিটি লাইন থাকবে পাঠকের জন্য। প্রবন্ধ কম থাকবে। আমরা একখানা সুন্দর সংবাদ সাপ্তাহিক চালাব। স্বস্তিকা কখনও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নব সংস্করণ হবে না। বলাই বাহুল্য এসব ব্যাপারেই আমাদের চিন্তানায়ক ছিলেন হেমেনদা।

সকলের সব সামর্থ্য একত্র করে যা সংগৃহীত হ'ল দেখা গেল তাতে দেড় সংখ্যা কাগজের খরচ চলতে পারে। আমাদের অপরিপক্ব ব্যবসায় বুদ্ধিতে আমরা ধরে নিলাম যে দেশে আমাদের মত একখানি কাগজ চায় এমন হাজার হাজার পাঠক আছে। অতএব আমরা প্রতি সংখ্যা কাগজ বিক্রি করে যে টাকা পাব তা থেকে পরবর্তী সংখ্যার খরচ ঠিক উঠে যাবে। হয়ত কিছু লাভও থাকবে। রবীন হোড় ভরসা দিল ইতিমধ্যে সে আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করতে পারবে এবং কয়েক সংখ্যা কাগজ চললেই ঠিক একজন ''ফাইনান্সিয়ার'' জুটে যাবে। হেমেনদা স্বস্তিকার অবৈতনিক সম্পাদক এবং রবীন হোড় মুদ্রক ও প্রকাশক মনোনীত হলেন।

আমাদের সামর্থ্য অনুমান করেই সম্ভবতঃ কোন ভাল প্রেসই আমাদের কাজ নিতে রাজী হলো না। কেউ কেউ আগাম টাকা চেয়ে বসল যে আমরা মানে মানে সরে পড়লাম। শেষে বৌবাজার অঞ্চলে খুব সুখ্যাত নয় এমন একটি পল্লীর লাগোয়া একটি ছাপাখানার মালিক আমাদের কাজ নিলেন। ছাপাখানাটি অতীতে খুবই বড় ছিল। কিন্তু তখন তার অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ। টাইপ বেশীর ভাগই ভাঙ্গা। মালিক ভদ্রলোকের বয়স কম হলেও দেহ রোগজীর্ণ। ভদ্রলোকের ব্যবসায় বুদ্ধিও পরিপক্ব ছিল না। তখনকার কলকাতায় ডবল ক্রাউন চার পাতার (স্বস্তিকার মাপ) এক ফর্মা এক হাজার ছাপাতে খরচ পড়ত পয়ঁত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। ইনি আমাদের কাছে দাবী করেছিলেন ত্রিশ এবং শেষে রেট ঠিক হয়েছিল পঁচিশে। কোন আগাম টাকা চান নি। একথা অস্বীকার করলে অন্যায় করা হবে যে ভদ্রলোকের মনেও লাভের চিন্তার চেয়ে একখানি সাপ্তাহিক কাগজের মুদ্রাকর হবার আগ্রহ কাজ করছিল বেশী।

জন্মাষ্টীর শুভদিনে স্বস্তিকা পত্রিকা প্রকাশিত হবে ঠিক হ'ল। দামও ঠিক হ'ল দুআনা প্রতি সংখ্যা। নিজেরাই লেখা তৈরি করে অঙ্গ সৌষ্ঠবের নক্সা করে দিন রাত ছাপাখানায় পড়ে রইলাম। কিন্তু প্রেসের দক্ষতা ছিল খুবই সীমিত। ফলে সবাই মিলে দুরাত জেগেও এবং হাতে হাতে কাজকর্ম এগিয়ে দিয়েও কাগজ বাজারে বের করতে দিন দুয়েক দেরী হয়ে গেল। ফলে একটা খুব মারাত্মক ব্যবপার ঘটে গেল। হায়দরাবাদের নিজাম তখন আজাদীর খোয়াব দেখছেন এবং নানাভাবে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করছেন। নিজামের এই সব ঔদ্ধত্য এবং সে ব্যাপারে ভারত সরকারের নির্লিপ্ততার তীব্র সমালোচনা করে স্বস্তিকার প্রথম সংখ্যার প্রধান রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। কিন্তু স্বস্তিকা যখন পাঠকদের হাতে পৌঁছুল তার আগেই ভারতীয় বাহিনী চার দিক থেকে নিজামের রাজ্যে প্রবেশ করে বিজয় গর্বে এগিয়ে চলেছে। দেশে তখন তাই নিয়ে প্রচণ্ড উন্মাদনা।

স্বস্তিকার প্রথম প্রকাশের ইতিহাস হয়ত এখানে শেষ করলেই ভাল হ'ত। কিন্তু পরবর্তী আরও কিছু কথা না লিখলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথম সংখ্যা স্বস্তিকা বাজারে বেরবার পর তা সমাদরেই গৃহীত হয়েছিল। দু'হাজার কাগজ ফুরিয়ে যেতে লেগেছিল দিন তিনেক। কিন্তু তাতে অর্থাগম হয়েছিল সামান্যই। তার উপর প্রেসের মালিক বলে দিলেন তিনি আর স্বস্তিকা ছাপাবেন না। থানা থেকে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর নিয়েছে এবং তিনি বুঝে নিয়েছেন সরকার স্বস্তিকার উপর খুব সদয় নন। তাঁকে অনেক করে বোঝান হ'ল। শেষে হেমেনদা বললেন তিনি যেন পুলিশ আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু জানতে চায় সব জানিয়ে দেন। আমাদের মধ্যে গোপন কিছু নেই এবং পুলিশ আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু জানুক তাতে আমাদের ক্ষতি কিছু হবে না। ভদ্রলোক খানিকটা শান্ত হলেন। কিন্তু কয়েক সংখ্যা বাদেই তিনি একেবারে বিগড়ে বসেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতেই হয়।

স্বস্তিকার বিরুদ্ধে প্রথম পুলিসী ব্যবস্থার কথা বলে এই প্রসঙ্গের উপসংহার টানব। পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে সরকারের ঘরে দুখানা করে কপি জমা দিতে আমরা জানতাম। কিন্তু কোথায় দিতে হয় তা আমাদের জানা ছিল না। লালবাজার থানা থেকে বলে দিল লালবাজারের প্রেস সেকশনে দিতে হবে। আমরা তাই দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুদিন পরেই হঠাৎ আমাদের মুদ্রক ও প্রকাশক রবীন হোড়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (প্রেস) দপ্তরে দুখানা করে বিনামূল্যে কাগজ জমা দেবার আবশ্যিক বিধি আমরা ভঙ্গ করেছি। সেদিন আমরা জানতে পারলাম লালবাজারে কাগজ দেওয়া সৌজন্যের ব্যাপার। না দিলে তারা বাজার থেকে কিনে নেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কাগজ পাঠান বাধ্যতামূলক। সেদিনই জামিন পাওয়া গেল। দু-দিন বাদে ব্যাঙ্কশাল পুলিশ কোর্টে মমলা উঠল। আমরা কোন উকিল দিলাম না। আসামী নিজের মামলা নিজেই চালালেন। তিনি আমাদের খাতাপত্র থেকে দেখালেন যে আমরা পুলিশকে নিয়মিত কাগজ পাঠিয়েছি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কাগজ পাঠান হয়নি। কারণ ঐ বিধি আমাদের জানা ছিল না। কাজেই আইনের বিধি যা ভঙ্গ করা হয়েছে না জেনেই করা হয়েছে---ইচ্ছে করে নয়। হাকিম সম্ভবতঃ আসামীর কচি বয়স দেখে সদয় হয়েছিলেন। সাজা হ'ল আদালতের কাজ চলা পর্যন্ত আটক থাকতে হবে। কয়েক মিনিট পরেই হাকিম আসামীকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিলেন। এই প্রসঙ্গেরও অবসান হ'ল।

(স্বস্তিকার রজতজয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত। বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

ভারতের প্রথম টুজি ইথানল প্ল্যান্টের উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি।। গত ১০ আগস্ট পানিপথে ভারতের প্রথম দ্বিতীয় প্রজন্মের (২জি) ইথানল প্ল্যান্টের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায় এই প্ল্যান্ট দিল্লি সংলগ্ন এলাকায় দূষণ রোধে এবং কৃষি আয় বাড়াতে বড়ো ভূমিকা নেবে। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তৃতার সময় প্রধানমন্ত্রী জানান প্রায় ৯০০ কোটি টাকা মূল্যের এই প্ল্যান্টটি বছরে ৩ লক্ষ মেট্রিক টনের সমতুল্য গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনে সাশ্রয় করবে যা বছরে প্রায় ষাট হাজার গাড়ি রাস্তা থেকে সরানোর সমান। শুধু দূষণ রোধই নয়, প্রাইভেট ফার্ম প্রাজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নির্মিত 'ইনফিনিটি' প্রযুক্তির এই প্রকল্পটি আত্মনির্ভর ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

পানিপথের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এতে দূষণ সৃষ্টিকারী খড় ব্যবহার করার ফলে ইথানল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের আয়ও বাড়বে। বিশ্ব জৈব জ্বালানি দিবসে এই প্ল্যান্টটি উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানিপথের এই ইথানল প্ল্যান্টটি হবে এশিয়ার বৃহত্তম প্ল্যান্ট। তিনি জানান, "আমাদের দেশ প্রকৃতির উপাসনা করে। জৈব জ্বালানি হলো প্রকৃতি উপাসনার নামান্তর। আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরা এটা আরও ভালো বুঝবেন। জৈব জ্বালানির অথ হলো সবুজ জ্বালানি, প্রকৃতি রক্ষার জ্বালানি। এই আধুনিক কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হরিয়ানায় যেখানে প্রচুর পরিমাণে চাল ও গমের উৎপাদন হয়ে থাকে সেখানকার কৃষকরা ফসলের অবশিষ্টাংশ লাভদায়ক উপায়ে ব্যবহার করতে পারবে।

পানিপথে এই জৈব জ্বালানি কারখানা তৈরি হওয়ার ফলে ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে না ফেলে বরং তার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এর বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। প্রথম সুবিধা হলো ফসলের অবশিষ্টাংশ কাটা এবং তোলার জন্য নতুন পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে এই গ্রামগুলিতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, ফসলের যে অবশিষ্টাংশ কৃষকদের কাছে বোঝা স্বরূপ, সেই সমস্যা থেকে তারা মুক্তি পাবে এবং তাদের অতিরিক্ত আয়ের পথ প্রশস্ত করবে। তার সঙ্গে দূষণ হ্রাস পাবে এবং দেশে বিকল্প জ্বালানির নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

জুম্মাবারে বিরতির সময় বাড়ানো নিয়ে বচসা মালদার স্কুলে

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। মালদা জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার পর থেকেই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলমানরা বিভিন্ন অজুহাতে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে চলেছে। গত ৬ আগস্ট জেলার কালিয়াচক বৈষ্ণব নগরের লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। এই হাইস্কুলে আশি শতাংশ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক হিন্দু হলেও সম্প্রতি শিক্ষকদের একাংশ শুক্রবার এক ঘণ্টা টিফিন এবং নামাজের জন্য ম্যানেজিং কমিটির কাছে সময় আদায় করে নেয়। ফলস্বরূপ অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষজন এর প্রতিবাদ করে। তাঁদের বক্তব্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই শুক্রবারে বিদ্যালয়ে এক ঘণ্টা বিরতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

গত ৫ আগস্ট শুক্রবার টিফিনের সময় লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে দুই সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে টিফিন সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে কথা কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পরের দিন এই বিষয়ে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির বৈঠক হয়। সেখানেই বচসা থেকে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষের খবর লক্ষ্মীপুর গ্রামের দুটি পাড়ায় পৌঁছালে মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের মানুষজন হাসুয়া, বল্লম ও তরবারি নিয়ে হিন্দু পাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ স্কুলে পৌঁছে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ করে। ছাত্ররা পুলিশকে গ্রামের সংঘর্ষস্থলে যাওয়ার অনুরোধ করলে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাদের দিকেই তেড়ে যায়।

এদিকে গ্রামের হিন্দুরা জোটবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ালে দুষ্কৃতীরা একজন কিশোরীকে লাথি মারে ও একটি বাড়িতে হামলা চালায়। পরে পুলিশ এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় ছাত্র ও অভিভাবকদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও স্থানীয় মানুষজন একযোগে শুক্রবার একঘণ্টা বিরতি দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

অন্য একটি ঘটনায় ১৫ আগস্ট মালদা শহর থেকে ৫ কিমি দূরে কাজিগ্রাম চণ্ডীপুরে স্বাধীনতা দিবসের বাইক মিছিল যাওয়ার সময়ে মিছিল থেকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়ার জন্য স্থানীয় ক্লাবের মুসলমান সদস্যরা পঞ্চায়েত উপপ্রধানের উপস্থিতিতে ১১ জনকে বেধড়ক মারধর করে। দুষ্কৃতীরা বাইক আটকে জাতীয় পতাকা মাটিতে ফেলে তার অবমাননা করে এবং পুড়িয়ে ফেলে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিছিলকারীদের উদ্ধার করে। ইংলিশ বাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে থানায় এফআইআর করা হলেও এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৯

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

উপন্যাস

প্রবাল - বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ● এষা দে - একটি কাল্পনিক কাহিনি

সুমিত্রা ঘোষ- স্বপ্ন ধরার জন্য

জীবনের কথা

বিজয় আঢ্য

পুরাণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - বাঁধন

গল্প

শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তাস্য যশ, নিখিল চিত্রকর, সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রবন্ধ

রঙ্গাহরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর আচার্য, সুজিত রায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুজিত ঘোষ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ১২ ।।

অজস্র মানুষের ভিড়ে প্রভুকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব বঙ্কিম বাধা পেলেন অন্য এক ভক্তের কাছে। তাঁকে বার করে দেওয়া হলো।

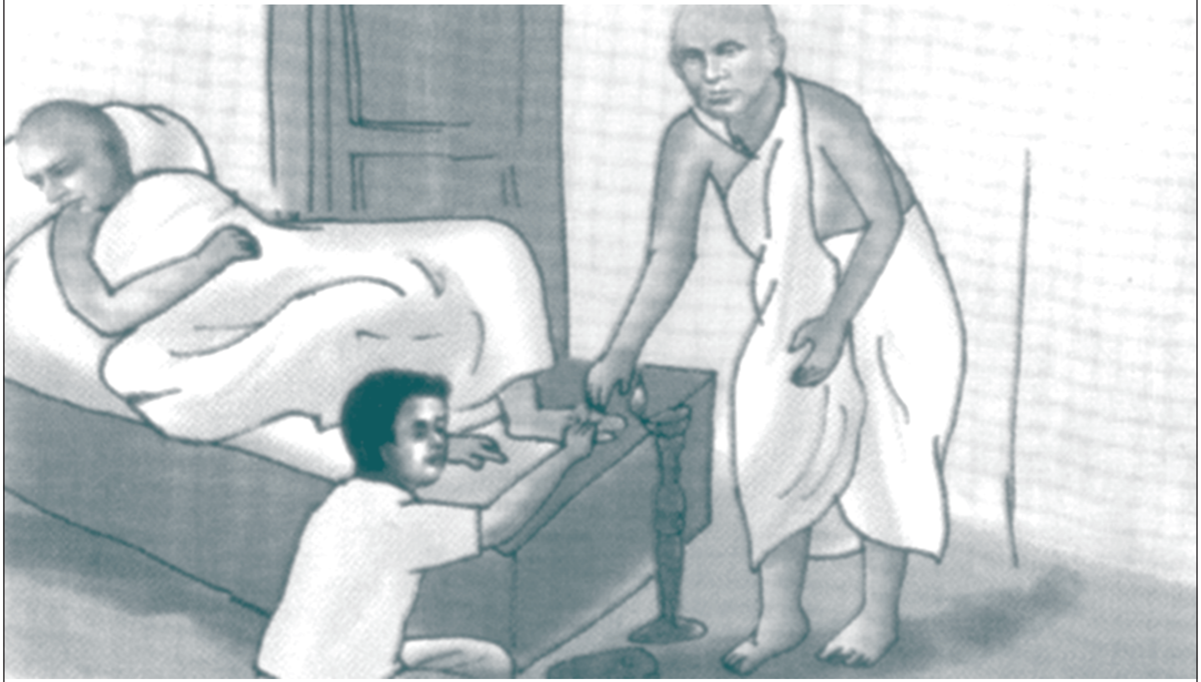

এতে এত ব্যথা পেলেন তিনি যে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান হতে দেখলেন মহেন্দ্রজীর পাশে মন্দিরে বসে আছেন। মন্দির নিস্তব্ধ। সামনে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় প্রভু শায়িত। ফুল-চন্দনের গন্ধে ভরা সেই ঘরে মহেন্দ্রজী বঙ্কিমের হাতে চন্দন মাখা তুলসী দিয়ে বললেন, 'দে প্রভুর চরণে দে, চিরকাল তাঁর হয়ে থাক।'

(ক্রমশ)